২৪২

সাক্ষরতা বুলেটিন

শ্রাবণ ১৪২১
জুলাই ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪২ শ্রাবণ ১৪২১ জুলাই ২০১৪

সূ চি প ত্র

৩ **তপন কুমার দাশ**
এই লভিনু সঙ্গ তব,...

৭ **শফি আহমেদ**
শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা-প্রসঙ্গ

১৫ **শাওয়াল খান**
সাক্ষরতা ও শিশু-চর্চায় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভের ভূমিকা

১৯ **মো. জাকির হোসেন**
মানসম্মত শিক্ষা: শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ

২১ **মাহমুদ হাসান রাসেল**
শিক্ষার মান উন্নয়ন: আমাদের করণীয়

২৪ **রোজা শাওয়াল রিজওয়ান**
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নির্যাতন: আর কতদিন

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

তপন কুমার দাশ

এই লভিনু সঙ্গ তব,----

অবিনশ্বর এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। তথাপি এ ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই কিছু মানুষ এমন কিছু প্রতিভা বা গুণাবলীর সাক্ষর রাখেন যার ফলে তারা হন চিরস্মরণীয়, অনুকরণীয়। এমনই কয়েকজন মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে গণসাক্ষরতা অভিযান-এ, যা এ প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে উচ্চতর সম্মান, প্রতিষ্ঠিত করেছে মর্যাদার আসনে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, আ. ন. ম. ইউসুফ, মুহাম্মদ আজিজুল হক সাহেবের কথা। যারা জীবনের অপরাহ্নে যুক্ত হয়েছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে। দু'হাত ভরে দিয়েছেন তাঁদের মেধা, দক্ষতা, তাদের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলে। তাঁদের সঙ্গ পেয়ে উন্নত হলাম, সুন্দর হলাম আমরা। ঋণী হয়ে থাকলাম তাঁদের কাছে।

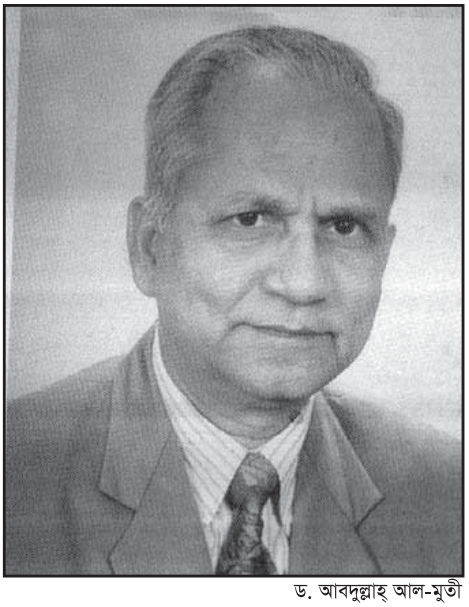

ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী

প্রায় চৌদ্দ বছর ডানিডার সহায়তায় পরিচালিত গণশিক্ষা কর্মসূচিতে নোয়াখালীর প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করতে গিয়ে সব সময়ই মনে করতাম দেশের জন্য যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর তা কেবল আমরাই করছি। গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে কাজ করতাম বলে এবং তাঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত শোষণ বঞ্চনা নিয়ে কথা বলতাম বলে শহরের মানুষদেরকে তখন টিভি সিনেমার খলনায়কের মত বলেই ভাবতাম, আর এ ভাবনা মনের মধ্যে রেখেই ১৯৯৩ সালে জীবন ও জীবিকার জন্য আমাকে ঢাকায় আসতে হলো, যোগ দিলাম গণসাক্ষরতা অভিযান-এ।

আমার যোগ দেয়ার ক'দিন পরেই এ প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদে যোগ দিলেন জনপ্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আগত ড. আল মুতী শরফুদ্দিন। আমার সকল ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দু'দিনের মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন আমাদের প্রিয় মুতী ভাই। শিক্ষা সচিব পদ থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এ বিশাল হৃদয়ের মানুষটি আমাদেরকে বুঝতেই দিলেন না যে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক উপরে অবস্থান করেন। আমরা তখন সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এনজিও ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতাম। মুতী ভাইকে একদিন বললাম, শিক্ষা ও সাক্ষরতা ধারণা নিয়ে একটি ক্লাশ নিতে।

তিনি বললেন, ও সব বিষয়ে কাউকে পড়াতে হলে তো আগে আমাকে পড়তে হবে।' আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম পরদিন মুতী ভাই এসে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে বসেছেন ক্লাশ করতে, তাঁর ভাষায় পড়ার জন্য। তিনি বলেন, শিক্ষা সচিব থাকাকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বই লেখার আগে তিনি দু'বছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর এই স্বেচ্ছা ডিমোশান দেখে অনেকেই নাকি হাসাহাসিও করেছিল।

বিজ্ঞান লেখক হিসেবে, সরকারি আমলা হিসেবে এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কিন্তু অনায়াসেই ঠাঁই করে নিয়েছিলেন এনজিও জগতে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। মুতী ভাই অন্যদের সম্মান দিতে জানতেন, অনুপ্রেরণা দিতে জানতেন। একবার এক প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠান থেকে বয়স্ক শিক্ষার উপর একটা বই প্রণয়ন করে মুতী ভাইকে দেয়া হলো বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বা ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে। মুতী ভাই বইটি আমাকে দিয়ে বললেন, মতামত তৈরি করার জন্য। আমি সিরিয়াসলি বইটি দেখলাম এবং অনেক কিছুই পরিবর্তনের কথা বললাম। সব শুনে মুতী ভাই বললেন, এত সব যোগ করলে তো বইটি আপনার লেখা বই হবে, তাদের নয়। তিনি বইটির উপর সযত্নে "শতফুল ফুটতে দাও" লিখে নিচে সই করে দিলেন।

প্রায় তিন বছর পর তাঁর অসুস্থতাজনিত কারণে গণসাক্ষরতা অভিযান ছাড়ার প্রাক্কালে মুতী ভাই বললেন, আমি আপনাদের

সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে তেমন কোন যোগ্যতা দেখাতে পারিনি। আমি তো আসলে অন্য জগতের মানুষ। আমি লেখালেখিই করতে চাই। যদিও গণসাক্ষরতা অভিযানে থাকাকালীনই তিনি লিখেছিলেন, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে* শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। বইটি তিনি তুলে দিয়েছিলেন অগণিত শিক্ষাকর্মীদের হাতে। এর কিছুদিন পরই শুনলাম মুতী ভাই অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে আমেরিকা যেতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দুরারোগ্য ক্যানসারের কাছে তিনি পরাভূত হলেন, বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকল তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য, সারল্য, সকলকেই বন্ধু ভাবার এক অপরিসীম ঔদার্য। আমাদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের ন্যায়।

আ. ন. ম. ইউসুফ

এরপর আমরা পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম প্রাক্তন মুখ্যসচিব জনাব আ. ন. ম. ইউসুফ-এর সঙ্গে। আর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। গণসাক্ষরতা অভিযানের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি যোগ দিলেন এ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসেবে। কার্যত শুধু উপদেশ প্রদান নয়, তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এডুকেশন ওয়াচ কমিটি এবং পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে। এ দুটো দায়িত্বই তিনি পালন করেছেন সক্রিয়ভাবে এবং সফলতার সঙ্গে। একদিকে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার দাবীকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যদিকে গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই তার অনবদ্য অবদান গণসাক্ষরতা অভিযানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশ ও বিদেশের উচ্চতর স্থানে। এ প্রসঙ্গে আ. ন. ম. ইউসুফের মৃত্যুর পর *সাক্ষরতা বুলেটিনের* ১৪৩ সংখ্যায় ড. মনজুর আহমেদ লিখেছেন- "এডুকেশন ওয়াচের গ্রহণযোগ্যতা ও দেশে বিদেশে এর ইতিবাচক মূল্যায়নের পেছনে উপদেষ্টা পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য। উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি আ. ন. ম. ইউসুফের নিরলস নেতৃত্ব, বিচার-বিবেচনা, প্রজ্ঞা এবং একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ উপদেষ্টা পরিষদ তথা এডুকেশন ওয়াচের প্রচেষ্টাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ জন্যে প্রতিটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন বিভাগে ও জেলা শহরে সংলাপ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত জনপদে অনুষ্ঠিত এ ধরনের সংলাপে জনাব ইউসুফ সাগ্রহে উপস্থিত থেকেছেন ও আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিজের বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের চেয়ে রাজধানী থেকে দূরে এ ধরনের সভাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।"

একই সংখ্যায় প্রফেসর শফি আহমেদ শিক্ষা বিষয়ক একটি বিশেষ কমিটিতে ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে লিখেছেন। লিখেছেন, "শিক্ষা সচিব হিসেবে আ. ন. ম. ইউসুফ আমাদের সকলকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অভ্যর্থনা জানালেন। চিরাচরিত আমলার সম্ভাষণ নয়, খুবই আন্তরিক।

প্রথম দেখাতেই তাঁকে অত্যন্ত রুচিশীল ও পরিশীলিত ব্যক্তি বলে মনে হলো। কমিটি এমন দ্রুততায় করা হয়েছে যে, কাজের ধরন কি হবে তা নিয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আগে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়নি। আমার মতামত দেয়ার পালা আসলে বললাম, পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্লিখন দরকার। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ও গণমুখী করে গড়ে তোলার জন্য এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করা দরকার যা হবে ধর্মনিরপেক্ষ। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি আমার কাছে বৈষম্যমূলক মনে হয়েছে। আমার কথায় অধিকাংশ সদস্য সহমত প্রকাশ করলেন। ইউসুফ ভাই যে আমলা হিসেবে খুবই অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন তা তাঁর সেদিনের মন্তব্য থেকে সহজেই টের পেলাম। তিনি বলেছিলেন, খুব বৈপ্লবিক কিছু করার পরিকল্পনা না করাই ভালো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হলে এমন এক সরকার আসতে পারে যারা সবটা উদ্যোগকেই নস্যাৎ করে দিতে পারে।"

স্বল্প ও মৃদুভাষী আ. ন. ম. ইউসুফ সাহেবকেও আমরা যথারীতি ইউসুফ ভাই বলে ডাকতাম। তিনিও আমাদেরকে নাম ধরে ডাকতেন। কোন রকমের হাঁক-ডাক ছাড়া একান্ত নীরবে তিনি অফিসে আসতেন, তাঁর কক্ষে গিয়ে বসতেন এবং এক নজরে দেখে নিতেন দিনের সংবাদপত্রগুলি। একে একে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মীরা প্রয়োজন অনুসারে তাঁর কাছে যেত। তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সবার কথা শুনতেন ও সব প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করতেন। সাধারণত আমরা তাঁর কাছে যেতাম কোন সভায় সভাপতিত্ব করার প্রস্তাবনা নিয়ে, উপস্থিত থাকা বা গুরুত্বপূর্ণ কাউকে ফোন করা কিংবা কোন কাজের অগ্রগতি জানানো বা

কোন কাজ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেয়ার জন্য। তিনি সানন্দে সব কিছুতেই রাজী হতেন। বলা বাহুল্য, গণসাক্ষরতা অভিযানের নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমেও তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। তবে সেসব নিয়ে আমাদের পরিচালক মহোদয় কাজ করেন বলে আমরা তাঁর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম না।

মুহাম্মদ আজিজুল হক

ইউসুফ ভাই গণসাক্ষরতা অভিযানে কাজ করতেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে। তিনি এ সংগঠন থেকে কিছুই নেননি, কেবল দিয়েই গেছেন। অভিযানের পরিচালক জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, ইউসুফ ভাইয়ের অবর্তমানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হলো গণসাক্ষরতা অভিযানের। এ যে কত বড় ক্ষতি, তা কেবল আমরাই বুঝি। পদে পদে তা অনুভূতও হচ্ছে।

যে মত বা পথেরই হোক না কেন, মানুষের চরিত্রে থাকতে হয় দৃঢ়তা। তাঁকে হতে হয় আদর্শবান। ইউসুফ ভাই সে রকমই ছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযান আর একজন ইউসুফ ভাইকে খুঁজে পাবে কি না তা বলা মুশকিল।

ইউসুফ ভাই চলে যাওয়ার পর আমরা হারালাম গণসাক্ষরতা অভিযানের আর এক সুহৃদ মোহাম্মদ আজিজুল হককে, তাকেও আমরা আজিজ ভাই বলেই ডাকতাম। আজিজ ভাইও ছিলেন সিভিল সার্ভিসে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিও, ডিসি হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর নেয়ার পর পরই বেইস-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি সুনামের সঙ্গেই কাটিয়ে দেন প্রায় বছর দশেক। সেই সুবাদেই তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য এবং পরে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিলে আজিজ ভাই ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ সময়েই মূলত তাঁর সঙ্গে সরাসরি আমাদের কাজ করার সুযোগ ঘটে।

আমি এখানকার একটি ইউনিটের প্রধান বলে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমাকে আলোচনায় বসতে হতো। তিনি সব কিছুকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে এবং হাসি-তামাশার ছলে কঠিন সমস্যায়ও সহজ সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে পছন্দ করতেন। এ বিষয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, "আমি তো সহজ কথাই বলিয়াছি। কিন্তু প্রফেসররা মিলিয়াই তো আমার সহজ কথাটিকে কঠিন করিয়া তুলিল"। তিনি বলতেন, সোনার তরীতে রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন যে, এত বেশি ফসল নৌকায় তোলার পর কৃষকেরা আর নৌকায় উঠার জায়গা থাকল না। এ তো সহজ কথা। এ মধ্যে আবার ইহকাল, পরকাল, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি আসবে কেন?

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক থাকাকালে তিনি প্রতিদিনই সকাল বেলা মৃদু অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসে আসতেন। দাপ্তরিক কাজ কর্ম সারতেন। আর সময় হাতে থাকলেই আমাকে ডাকতেন। অত্যন্ত সুন্দর করে লম্বা স্বরধ্বনিতে তিনি টেলিফোনে আমাকে "ত-প-ন" বলে ডাকতেন। আমি তাঁর কক্ষে গিয়ে বসতাম। তিনি হাতের খোলা কলমটি এক পাশে রেখে দু'হাতের আঙ্গুল এক করে বলতেন, তারপর বলেন, কেমন আছেন? অফিসের অন্যরা বুঝত এখন আর এখানে কোন কাজের কথা হবে না। তার চেয়ে অন্য কাজে যাওয়াই ঢের ভালো। আর তখনই আমার মনে পড়তো পুরস্কার কবিতার ক'টি লাইন:

মন্ত্রী ভাবিল, যাই এই বেলা।
এখন তো শুরু হবে ছেলে-খেলা
কহে মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।

আজিজ ভাই খুবই মিষ্টি করে জানতে চাইতেন। "বলেন কি পড়ছেন, আর কি-ই বা লিখছেন আজকাল।" আমার উত্তর দেয়ার আগেই তিনি হয়ত বলতেন। "আমি এখন-----বইগুলি একটু নেড়েচেড়ে দেখছি"। তারপর তিনি সে সব বই প্রসঙ্গে বলা শুরু করতেন। আবার এও তিনি বলতেন যে, আজকাল এসব বই পড়া এবং শোনার লোক কই, মানুষের সময়ই বা কোথায়।

আমি আজিজ ভাইয়ের সঙ্গে দেশে বিদেশে অনেক ঘুরেছি। তাঁর সঙ্গে আমি সেভ দ্য চিলড্রেন-এর আমন্ত্রণে রাঙ্গামাটি গিয়েছি। ফেরার সময় এক রাত চট্টগ্রামে আমাদের থাকতে হবে। এ খবর শুনেই আজিজ ভাইয়ের মেয়ে এবং জামাতা যিনি নৌ-বাহিনীর একজন বড় কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন তাঁকে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু, আজিজ ভাই কিছুতেই রাজী হলেন না। তাঁর ভাষায়, আমি অফিসিয়াল কাজে এসেছি, এর মধ্যে আবার ওদেরকে ডিসটার্ব করবো কেন? অগত্যা আমরা সেদিনই শেষ ফ্লাইটে ঢাকা ফিরলাম।

তাঁর সঙ্গে ফিলিপিনস্ থেকে ফেরার পথে এক রাত আমাদের ব্যাংকক এয়ারপোর্টে থাকতে হলো। আমি তাঁকে প্রতি ঘন্টা বিশ ডলার ভাড়ায় একটি কক্ষে কয়েক ঘন্টা রেস্ট করতে বললাম। তিনি জানতে চাইলেন, এই সময়ে আমরা কি করব? উত্তর দিলাম ব্যাংকক এয়ারপোর্টে হাঁটা চলা করা মানুষদের সৌন্দর্য দেখব। অবলীলায় তিনি বললেন, তাহলে আমাকে কেন যে সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন? আমিও আপনাদের সঙ্গেই থাকব। আরও কত স্মৃতি।

বাস্তবিক পক্ষে আজিজ ভাই ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের বড়ো। কিন্তু ব্যক্তিগত মেলামেশায় মনে হতো আমরা সমবয়সী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জার্নি করার সময় পথিপার্শ্বের প্রকৃতি, রূপ, সৌন্দর্য দেখে যখন কোন মন্তব্য করতাম। আজিজ ভাই ততোধিক সরস মন্তব্য করে বুঝিয়ে দিতেন। তিনিও রয়েছেন আমাদেরই দলে। একথাটি মনে করেই ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম আজিজ ভাইয়ের স্মরণসভায় বলেছিলেন, আজিজ ভাই ছিলেন একজন "উইটি" মানুষ। চিরজাগ্রত। যৌবনদীপ্ত ছিল তার স্বভাব। আমি আজিজ ভাইকে কোনদিন মলিন বসন কিংবা মলিন চেহারায় দেখিনি। চলনে বলনে কথায় বা কাজে তিনি ছিলেন নমনীয়, তবে আপাদমস্তক একজন ভদ্র লোক। বর্তমান সময়ে এ ধরনের ব্যক্তিত্ব একেবারেই বিরল। বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজ ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে "আমাদের আজিজ ভাই: একজন সহজিয়া মানুষ" শিরোনামে ম. হাবিবুর রহমান লিখেছেন- আজিজ ভাই ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ, সহজ, সরল ও নিরহংকার। তিনি ছিলেন ভদ্র ও সদালাপী, প্রীতিপূর্ণ ও স্নেহপরায়ণ। আমরা অনেকেই তাঁর স্নেহাস্পদ তাঁর উদারতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য এবং বিনম্র প্রশ্রয়ে বয়স ও অভিজ্ঞতার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই তাঁর বন্ধু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলাম। অকপটে তিনি এমন কিছুই আমাদের সঙ্গে বিনিময় করতেন যার পেছনে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ শিখন থেকেই যায়। এমন এক অকৃত্রিম বন্ধু, উপদেশক ও দিক-নির্দেশকের দেখা মেলা এ জীবনে হয়তো প্রায় অসম্ভব।

বাস্তবিকপক্ষে, অফিসে কেউ কখনও আজিজ ভাইকে রাগতে দেখেনি কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলতেও শোনেনি। আজিজ ভাইকে কারো সঙ্গে অশালীন আচরণ বা ভাষার ব্যবহারও করতে দেখেনি। কারো কাজ মনঃপূত না হলে তিনি তাকে বুঝিয়ে বলতেন কি করা উচিত, না করা উচিত। আজিজ ভাইকে কোন আলোচনা, কথোপকথনে কেউ কখনও উত্তেজিত হতে দেখেনি, তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কথাবার্তা বলতেন, কখনও মতানৈক্য না হলে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও আলোচনা ছেড়ে উঠে চলে যেতেন।

আমি গণসাক্ষরতা অভিযানে প্রায় ষোল বছর ধরে রাশেদা আপার সঙ্গে কাজ করছি। সকল পরিস্থিতিতেই রাশেদা আপার অবিচল ও দৃঢ় অবস্থান আমি দেখেছি। কিন্তু আজিজ ভাইয়ের স্মরণ সভায় প্রথম বারের মতো দেখলাম তাঁর চোখে জল। অশ্রুসজল নয়নে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন গণসাক্ষরতা অভিযান তথা বাংলাদেশের এই একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপার্সন কাজী রফিকুল আলম। তিনি প্রাণভরে আজিজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করলেন। সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাদেরও যাওয়ার সময় হয়েছে। তার পরে তিনি ভারী কণ্ঠে মৃত্যুর পর সকলের দোয়া প্রত্যাশা করলেন। সকলেই হয়ত দু' চোখ বন্ধ করে সম্মতি জানাল।

মৃত্যু অবধারিত, অলঙ্ঘনীয়। মহাকাল সব কিছুকেই ধারণ করে আপন বক্ষে। সে অনুসারে সকল মানুষকেই বিলীন হয়ে যেতে হয় মহাকালের অতল গর্ভে। শুধু রয়ে যায় তাদের কৃত-কর্ম, স্মৃতি। এসব স্মৃতিই বড় হয়ে দেখা দেয় প্রিয়জনের কাছে। তবে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সীমাবদ্ধ থাকেন না, শুধু প্রিয়জনের মধ্যে, তাদের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে সর্বসাধারণের মাঝেও। তাদের অপরিসীম গুণাবলীর কাছে ক্ষুদ্র হয়ে যায় পার্থিব সকল রকমের দোষত্রুটি। পারিপার্শ্বিকতা তাঁদের দীপ্তিকে নির্বাপিত করতে পারে না। উর্দ্ধাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মতই তারা থাকেন চির জাগরুক, জ্যোতির্ময়। আঁধার নিশীথেও তাঁরা ধ্রুবতারা। মানুষ তাদের আচার-আচরণ, গুণাবলী স্মরণ করে।

আমাদের মুতী ভাই, ইউসুফ ভাই, আজিজ ভাই ছিলেন সে রকমেরই মানুষ। তারা শুধু আমাদেরকে দিয়েছেন, নেন নি কিছুই। তাঁদের সঙ্গে মিশতে পেরেছি বলে কিছুটা হলেও কেটেছে আমাদের মূর্খতা, মনের কালিমা। তাঁরা আমাদের যা দিয়েছেন তার সিকিভাগও যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলেই সার্থক হবে আমাদের এই পথচলা। সময় তো আমাদেরও বেশি নেই। মহাকাল যে ধেয়ে ধেয়েই আসছে।

সবশেষে, John Donne-এর লিখিত (A Valedication: Forbidding Mourning) কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

As virtuous men pass mildly away
and whisper to their souls, to go,
While's to some of their sad friends to say,
'The breath goes now' and some say `no'
So feet us melt, and make no noise
No tear-floods, nor sigh-tempests move.

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

শ ফি আ হ মে দ

শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা-প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে শিক্ষার চালচিত্র নিয়ে যত কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, মিছিল-সমাবেশ, তর্কাতর্কি-হাতাহাতি হয়, ঠিক তার তুলনীয় তেমন কিছু অন্যান্য দেশে ঘটে থাকে কিনা জানি না । এমনকি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যাপক ও নাড়ির যোগাযোগ রয়েছে যেসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের, যাদের সঙ্গে আমাদের দৃশ্যমান মূলগত ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে, সেসব দেশেও শিক্ষাজগত নিয়ে, বিশেষ করে গণমাধ্যমে এত খবর, এত দুঃসংবাদ, মন্তব্য, মন্ত্রী-অমাত্যদের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি. মধ্যরাতের টিভিতে বচন প্রদর্শনী, গণসাক্ষরতা অভিযান নামের এক শিক্ষাদ্যোগী সংস্থার আনুকূল্যে টেলিভিশনে শিক্ষা-সংবাদের সম্প্রচার, - এমন সব বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে কি না তা-ও জানি না। অবশ্যই আমাদের দেশে এসব যা কিছু ঘটে, সেসব অহেতুক কিছু নয়।

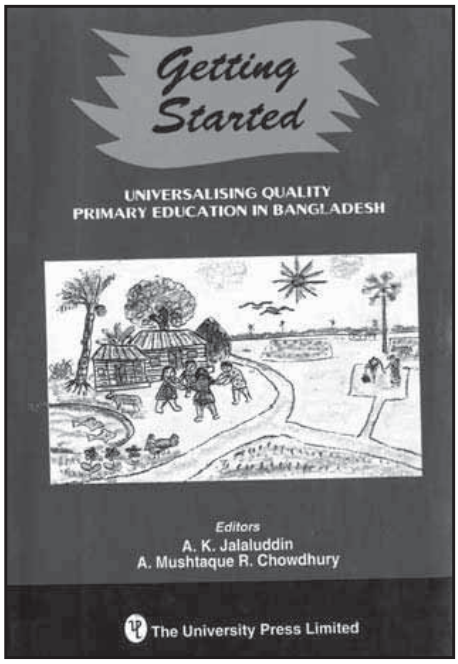

প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী কতিপয় ছাত্র ভাড়াটে দুর্বৃত্তের ভূমিকায় নেমে মানুষজনকে তাদের ছাত্রাবাসে নিয়ে নির্যাতন করবে টাকা আদায় করার লক্ষ্যে, এটা তো অবশ্যই খবর এবং এমন ঘটনা বিভিন্ন বিরতিতে ঘটতেই থাকে। আবার আমাদের মত বেশ আস্তে হাঁটা একটা সমাজে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের শিক্ষার আগল ভাঙার প্রয়াসে যখন ভ্রাম্যমাণ ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সেটাও সত্যিই একটা বড় সুখকর সংবাদ। শুধু প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশে যত পড়ুয়া আছে, পৃথিবীর অন্তত চল্লিশটা দেশের এককভাবে যে মোট জনসংখ্যা তা আমাদের এই মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যার চেয়েও কম। আর এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর সব বিষয়ের সব বই বিনামূল্যে ঠিক সুনির্দিষ্ট দিনে ঢাকার মতিঝিলের স্কুল থেকে বান্দরবান এবং চর ফ্যাশনের প্রত্যন্ত স্কুলে পৌঁছে দেবার ঘটনা নিশ্চয়ই খুবই বড় একটা খবর। কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির কথিত অভিযোগের চেয়ে অন্তত এই খবর তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গত এক বছরেরও কম সময়ে দু' দু'বার প্রবল জাতীয় সোরগোল সৃষ্টি করেছিলাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডস-এ নাম তোলার জন্য। দেশব্যাপী ত্রিশ কোটিরও বেশি বই বিনামূল্যে বিতরণের এমন ঘটনা ওই রেকর্ড বইয়ে তোলার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নিলে হয়ত আমাদের এমন শিক্ষা-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত সারা দুনিয়ায়। এখনও যা সময় আছে, তাতে আগামী পহেলা জানুয়ারির বই-উৎসব উপলক্ষে রেকর্ড গড়ার খবর অন্তর্ভুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশের একটা সাম্বাৎসরিক শিক্ষা-সংবাদ আছে, যা আমাকে গভীরভাবে বেদনা-নির্যাতিত করে। এবারও কয়েকদিনের কাগজে ছবি দেখেছি, শুধু টিনের চালা, আধা-পাকা নয়, সুপরিকল্পিত সুনির্মিত কংক্রিটের ভবন, শিক্ষালয়, প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গেল । দুঃসহ এসব শিক্ষা-বিষয়ক সংবাদ আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠলেও প্রকৃতির তীব্র করাল রোষের বিপরীতে এমন সংবাদে উদ্বেল ও উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

● ● ●

বাংলাদেশের শিক্ষার সাধারণ চালচিত্রের কথা বলতে গিয়ে গৌরচন্দ্রিকাটা বেশ বড় হয়ে গেল। যদিও এই চিত্রটাও বিশেষভাবে আংশিক। বর্তমান আলোচনার মূল জায়গাটায় ফেরার জন্য সাধারণভাবে কিছু স্বীকৃত তথ্য প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করতে চাই। অন্তত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ নিজেকে এক ধরনের গৌরবের স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সেই কৃতিত্বটা প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে। অমর্ত্য সেনের মত আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতির কথা বারবার উল্লেখ করেছেন এবং তা বাংলাদেশে নয়, বর্হিবিশ্বে। তিনি বার বার ভারতের উদাহরণ টেনে এনে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত পূর্ণ-বিকাশ না হওয়ার পরও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর প্রশ্নাতীতভাবেই বলা যায়, সামাজিক সূচকের এই উন্নতির মধ্যে মৌলিক শিক্ষার বিস্তার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে তার বর্তমান ইতিবাচক প্রভাব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

স্কুলে ভর্তি হবার যে বাস্তবতা যাকে আমরা সাধারণভাবে অভিগম্যতা বলে থাকি, সে বিষয়ে বাংলাদেশের দৃশ্যমান এবং প্রায় অবিশ্বাস্য সাফল্য সারা দুনিয়ার সম্ভ্রম ও বিস্ময় অর্জন করেছে। মফঃস্বল এলাকার কোন সড়কপথ বা নদীপথে যাবার সময় স্কুলের ইউনিফর্ম পরিহিত সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাওয়া বালিকাদের চোখ-জুড়ানো মিছিল দেখে বিশেষভাবে পুলকিত বোধ করি। অবশ্য এটা খুব সত্যি কথা যে, ভর্তি হবার পর বিভিন্ন শ্রেণী থেকে অনেকেই ঝরে পড়ছে। এই ঝরে পড়ার সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবিত, আমাদের অভিগম্যতার সাফল্য তাতে অনেকটাই ম্লান ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়া এবং তারপর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে না পারা বা ঝরে পড়া বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যান আছে। আমাদের অনেকেরই আবার সঙ্গত কারণেই এমন সরকারি পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ আছে। আরো সন্দেহ আছে যে, সরকার কি সত্যিই এ বিষয়ে ভাবিত বা উদ্বিগ্ন? সকল ধরনের সরকার-বিরোধী গোষ্ঠী সকল সময় এ বিষয়ে তাদের উৎকণ্ঠা ও সরকারি আন্তরিকতার অভাব নিয়ে সোচ্চার থাকেন। শিক্ষা নিয়ে এদেশে কয়েক শ' বেসরকারি সংগঠন কাজ করে থাকে, তারাও প্রধানত সরকারি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অর্থ বরাদ্দ, সমন্বয়হীনতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অভাব বিষয়ে বিরতিহীনভাবে প্রশ্ন তুলে থাকেন। তাদের সমালোচনা বা নিন্দার সবটাই প্রায়-সত্য এবং এসব সংগঠন যে কর্মনিষ্ঠ এগুলো তার প্রামাণ্য ও জবাবদিহিমূলক উদাহরণ।

এইসব সংগঠন বিভিন্ন বিরতিতে নানা নামে, শিরোনামে তাদের গবেষণার ফলাফল বা প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ইউনেস্কো থেকে আরম্ভ করে, ঢাকার প্রধান নাগরিক কেন্দ্রে অবস্থিত সংস্থা পার হয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী কোন অঞ্চলের যেসব সংগঠন এই অভিগম্যতা, ঝরে পড়া অথবা প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না বলে যে চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বা প্রতিবিধানের জন্য যেসব দাওয়াই বাতলাচ্ছে, আমার কাছে তার প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

বিভিন্ন সংস্থা প্রায় একই কথা (বলা যায় ৯০%) একই ভাষায় বলছেন। সুপারিশের সুরও একই লয়ের, ভূমিকাও প্রায় একই রকমের। প্রাথমিকভাবে সরকারের কিছুটা গুণগান করা, প্রায়শই INFEP থেকে DNFE/BNFE-র জন্মকথা ও বিবর্তন ইত্যাদি। যেটাকে আমরা duplication বা পুনরাবৃত্তি বলি, গবেষণা উদ্যোগের মাধ্যমে বা প্রবন্ধে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিরতিহীন চর্চা চলছে। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নিজেদের মত করে কাজ চালিয়ে যায়, পুনরাবৃত্তি বিষয়ে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আর দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা সরকারি প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটলে যে এমন অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়, তা-ও আমরা জানি।

আমরা জানি যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি, উপজেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেনি, তারপরও যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা অভিগম্যতা, ঝরে পড়া, মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থতা, গ্রাম-শহর ও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সুপরিজ্ঞাত বৈষম্য নিয়ে বিরতিহীনভাবে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করছেন, তাদের এই কাজের সুনির্দিষ্ট অনুপ্রেরণা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বহির্বিশ্বে যতটা সম্ভ্রম ও প্রশংসা কুড়িয়েছে, ঠিক তার অনুরূপ স্বীকৃতি জোটেনি স্বদেশের বৃত্তে। বাংলাদেশে মালালার মত কাউকে মৃত্যুশিবির থেকে ফিরে আসতে হয়নি, কিন্তু এখানেও ইসলামকে হেফাজত করার লক্ষ্যে সুসংগঠিত ও সুবিপুল সংগঠন আছে। এদের নেতা-কর্মীরা সপ্রতিজ্ঞভাবে নারীর আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য/অপ্রকাশ্য অবস্থান নিয়ে থাকে। এমন দেশে স্কুল যাওয়ার উপযোগী বয়সের কন্যাশিশুরা স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। এমন অর্জনটাকে শুধু বুড়ি-ছোঁয়ার মত টোকা দিয়ে আমরা কোমরে গামছা বেঁধে অভিগম্যতার আলো-আঁধারি অলি-গলির সংবাদের পেছনের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে উঠি। অবশ্য বলা যেতে পারে, গবেষকদের এটাই মূল কাজ এবং তাঁদের চিহ্নিত বিবিধ খুঁত-নির্দেশনা থেকে সরকার ও অন্যান্য সকর্মক গোষ্ঠীর অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকে। বলা বাহুল্য, এমন উদ্যোগ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযোগ্য ইতিবাচক ও পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিন্তু এমন একদল সমগোত্রীয় গবেষক আছেন যাঁরা তাঁদের কাজের জায়গাটার এই কেন্দ্রিকতার এত অত্যধিক ব্যবহার করেন যে, তা তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এটা সত্যি যে, অভিগম্যতার ব্যাপক সুফলটাই

নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষক যখন এই অতি-পরিজ্ঞাত কথাটাকেই তাদের প্রবন্ধে/গ্রন্থে শুধুই তথ্য হিসেবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ক্লান্তিহীন, তখন মনে হয় এঁরা যদি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ-অগ্রগতির অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে খোঁজ-খবর করতেন এবং সেসব নিয়ে বিশ্লেষণ করতেন, তা হলে দেশ ও সমাজ নিশ্চয়ই আরো উপকৃত হত।

শিশুরা ঝরে পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, পুরুষের চেয়ে নারী নিরক্ষরের সংখ্যা বেশি, গ্রামের চেয়ে নগর-অঞ্চলে সুযোগ-সুবিধা বেশি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে, শিক্ষা-উপকরণ নেই, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা ইত্যাকার বৃত্তাকার একাকার সমস্যার উল্লেখ অসংখ্য লেখায় পড়তে পড়তে পাঠকের মধ্যে এক ধরনের ক্লান্তি জন্মায়। কিন্তু আবারও স্বীকার করতেই হয়, এসবই সত্য এবং এসবই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আবার আবশ্যিকভাবেই একটা কথা স্মরণে আসছে, কার্ল মার্কসের সমাধিলিপিতে একটা অসাধারণ অকাট্য প্রবচন লেখা আছে, যার সাধারণ মানেটা এই রকম যে, পৃথিবীতে যে প্রবল সামাজিক বৈষম্য আছে, তা নিয়ে বহুকাল ধরে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে, এখন যা দরকার তা হল এই সমাজ ব্যবস্থাটাকেই পরিবর্তন করা।

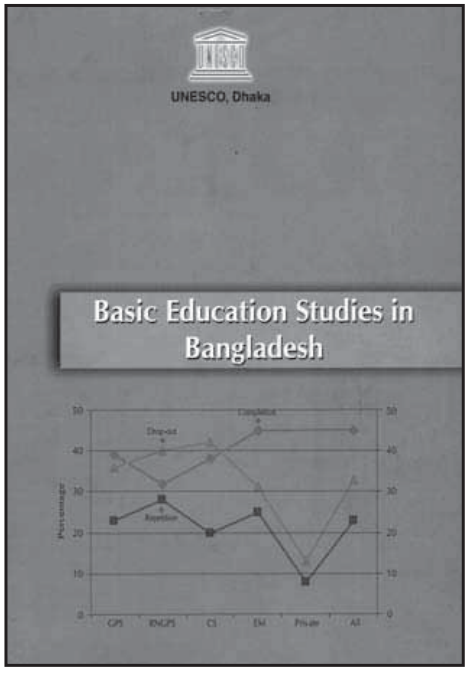

● ● ●

স্কুল থেকে, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে, তৃতীয় শ্রেণী... থেকে শিশুরা ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে যে সরকারি/ গোষ্ঠীগত/ সামাজিক ব্যর্থতার বিষয় আছে, তার জন্য এমন সব পেশাজীবী গবেষকবৃন্দ সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই প্রধানত দায়ী করে থাকেন। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, এখানেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নন্দ ঘোষ। কিন্তু পরিবারের উপার্জনক্ষম যে ব্যক্তিটি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য ঘটনায় আহত বা নিহত হন অথবা শুধুই বেঁচে থাকার জন্য অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে এক বছরের মধ্যেই যখন কোন পরিবারকে স্থানান্তরিত হতে হয়, আইলা বা সিডর যখন শুধু জৈবিকভাবে বেঁচে থাকার সমস্যাটাকেই প্রকটিত করে তোলে, ব্রহ্মপুত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন সাত গ্রামের স্কুল ভবনকে গ্রাস করে পরিবেশ দূষণের প্রতিশোধ নেয় এবং এই সবক'টি বাস্তবতার প্রভাবে যখন স্কুল থেকে শিশু ঝরে পড়ে এবং আমরা ঠান্ডা ঘরে বসে যখন এক বছরে সারা দেশে ঝরে পড়ার পরিসংখ্যান মেলাই এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খুঁত ধরার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করি, তার মধ্যে তথ্য পরিবেশনায় ভ্রান্তি না থাকতে পারে তবে বাস্তবতাকে সব দিক থেকে পর্যালোচনার একটা ত্রুটি বা logical fallacy থেকে যায়।

দারিদ্র্য নিরসনকে যদি শিক্ষার অগ্রগতির বা অভিগম্যতারএকটা প্রধান শর্ত বলে বিবেচনা করি (প্রায় সব গবেষকই সেভাবেই বিবেচনা করেন), তা হলে দারিদ্র্য দূরীকরণের দায়টা নিশ্চয়ই প্রধানত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তায় না। দারিদ্র্য এবং শিক্ষা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং শিক্ষা, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (domestic migration) এবং শিক্ষা, মৌলবাদী প্রচারণা ও শিক্ষা, দেশীয় পরিসম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে দুর্লঙ্ঘ্য অলঙ্ঘ্য চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ কিন্তু প্রত্যাশিত মাত্রায় দেখা যায় না।

বেসরকারি সংস্থাগুলি দাতাদের নানা শর্তারোপের মধ্যেই কাজ করে থাকে। আমার এমনটি মনে হয়েছে, আজ থেকে দু'দশকের কিছু আগেও শিক্ষা নিয়ে গবেষণা বা সংগ্রহণে যে ধরনের উদ্ভাবনী চিন্তা, প্ররোচনা ও প্রণোদনা লক্ষণীয় ছিল, সেটা আজ আর একই মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় না। সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মধারার মধ্যে যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সংহত হবার প্রত্যাশা ছিল, তা ঠিক কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। এটি অবশ্য একেবারেই ভিন্ন প্রসঙ্গ। সকল গবেষককেই নিশ্চিতভাবেই একথা স্বীকার করতে হয়, আমাদের শিক্ষায়, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক সংকট মূলগতভাবে দারিদ্র্যর সঙ্গে। আমরা বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনিবার্যভাবেই অতিদরিদ্র, হতদরিদ্র, দারিদ্র্যসীমার নিচে, গ্রামীণ-ভূমিহীন দরিদ্র ও নাগরিক ছিন্নমূল দরিদ্র, পথশিশু, সুবিধাবঞ্চিত, আয়-উপার্জনহীন মানুষ, ভাসমান মানুষ, প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল বা চরাঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলে থাকি।

বহু গবেষণায়, বহু আলোচনায় 'সবার জন্য শিক্ষা'-র (এখন আবার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, প্রত্যেক শিশুর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক প্রভৃতি শ্লোগান বেশ প্রবল এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।) প্রসঙ্গ এবং গোল পোস্ট বার বার সরিয়ে দেবার অপরাধ বা অদক্ষতার কথা বলা হয়। তার অত্যন্ত বাস্তবিক ও

সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশের সরকার, উন্নত, শিল্পোন্নত দেশের সরকার, জাতিসংঘ সবাই এর সপক্ষে সায় দিয়েছে, অতএব দায়ও স্বীকার করতে হবে তাদের। ওই প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা, আবার প্রতিশ্রুতির পুনরুচ্চারণ এবং সাহায্যদানের নতুন প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি 'সবার জন্য শিক্ষা'-র ব্যাপকতায় আয়তনগত মাত্রার প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

প্রথম দিকে যদিবা স্কুলের বাইরে থাকা শিশু, পথশিশু, বস্তিবাসী শিশু, সমতলের প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের প্রসঙ্গ নিয়ে গবেষণা ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, 'সবার' শব্দটির সত্যিকার এবং আক্ষরিক এবং আন্তরিক এবং সমুচিত এবং বৈজ্ঞানিক পরিসীমা চিহ্নিত করার জন্য আমরা ক্রমান্বয়ে বান্দরবানের প্রত্যন্ত গ্রামসমূহের নাতিসংখ্যক অধিবাসী, দুরতিক্রম্য যোগাযোগব্যবস্থার ভিন্ন পারের মানুষ, বিভিন্ন আদিবাসী ভাষাভাষী মানুষ (প্রায় অর্ধশত আদিবাসী ভাষাভাষীর সংখ্যা হয়ত দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪ ভাগ, কিন্তু নাগরিক অধিকারের প্রয়োগে তাদের সকলের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার ও তার বাস্তবায়ন ছাড়া যে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জিত হবে না, সেকথা নিরন্তর বেশ জোরেসোরে বলছি।), দেশের বিভিন্ন জেলার পতিতালয়ের শিশু, কারাগারে বন্দী শিশু এবং অবশ্যই নানা মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অভিগম্যতার ব্যাপারে বার বার দাবি তুলছি, এসবকে পৌণঃপুণিক গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করছি।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি যে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, সে বাংলাদেশে হোক বা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশেই হোক, তার নিষ্ঠুর এবং অদ্বিতীয় ব্যাকটেরিয়া যে দারিদ্র্য, এ নিয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। দারিদ্র্য নির্মূল করতে না পারলে প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা, পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা, বাস্তবায়নের অদক্ষতা থেকেই অনিবার্যভাবে।

এ ধরনের একটি পর্যবেক্ষণকে হাস্যকর বিবেচনা করেই নাকচ করে দেয়া যায়। দরিদ্র দেশসমূহের এমন বহুমুখী সমস্যা আছে, যেগুলোর দূরীকরণ যুগসাপেক্ষ ব্যাপার। পরিসম্পদের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, সামরিক বা অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, আন্তঃদেশীয় আন্তর্জাতীয় সহিংস বিভেদ (সুদান, নাইজেরিয়া, সিয়েরো লিওন, ইথিওপিয়া ইত্যাদি), গোষ্ঠীতন্ত্র প্রশাসনিক সংস্কারের দুরারোগ্য দুর্বলতা বহু দরিদ্র দেশকে এমনভাবে পঙ্গু করে রেখেছে যে, সেখান থেকে মুক্তি পাবার দিনক্ষণ ঠিক করা বড়ই কঠিন কাজ।

বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক, দুর্গম পাহাড়ী ও চরাঞ্চল আছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যা প্রকট, অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথেষ্ট দৃশ্যমান হলেও এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা শতকরা হিসেবে কমলেও মোট অঙ্কের হিসেবে তা হ্রাস পাচ্ছে না। তা হলে কি দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ার একটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত 'সবার জন্য শিক্ষা' আন্দোলনের গতির ওপর লাগাম টেনে ধরব? না নিশ্চয়ই তা নয়। শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা-কর্মে সরকারি প্রতিশ্রুতি, অভিলক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা কি ছিল এবং তার কতটুকু সমাধা হল, এমন সব পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট বিরতিতে হাজির করার মধ্য দিয়ে এমন অনুশীলনের বৃত্তাবদ্ধ গতি প্রদর্শন না করে যদি আমাদের অনাদি দারিদ্র্যপীড়িত সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিন্যাসের সঙ্গে শিক্ষার প্রগতি-সমস্যাকে যুক্ত করতে পারি, তবেই মূল্যবান কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনেকদিন আগে দারিদ্র্য এবং বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

কিন্তু অনুরূপ কাজের খুব বেশি খোঁজ পাওয়া যায় না। প্রথাগত বহু-চর্চিত সালওয়ারি হার, বিভাগওয়ারি অর্জন, লিঙ্গওয়ারি বৈষম্য, নগর ও অ-নগরের বিভাজন ইত্যাকার পরিসংখ্যানগত চিহ্নায়ন নীতিনির্ধারণে এবং তথ্য পরিবেশনায় নিশ্চয়ই কিছুটা সহায়তা করতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্য ও তদ্‌জাত বিরোধী উপাদানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণার মৌলিক অন্বেষা নির্ধারণ করতে হবে। এর ফলে, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার জন্য একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে (অথবা শিক্ষাখাতে অপ্রতুল বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে) অভিযুক্ত করার প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং তার আবশ্যিক প্রতিক্রিয়ায় সরকারি-বেসরকারি সমঝোতা গতিশীলতা অর্জন করবে।

দেশে দারিদ্র্য নেই, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস নেই, নদী ভাঙ্গন নেই, কর্ম সংস্থানের প্রবল কোন সমস্যা নেই, পরিসম্পদ সংগ্রহ ও বিতরণের কোন সংকট নেই, অথচ শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে, তাহলে অবশ্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করা যাবে। অভিগম্যতার বাইরে আমাদের প্রধান একটি উদ্বেগের কেন্দ্র হল শিক্ষার মান। যত টাকাই বরাদ্দ হোক, ব্যয়/অপব্যয় হোক, অবকাঠামোর জন্য যতই উদ্যোগ নেয়া হোক না কেন, দিনের শেষে শিশুটি কি শিখছে, সেটাই আসলে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কয়েক বছর আগে *এডুকেশন ওয়াচ*- এর এক শ্রমসাধ্য ও কাঠামোবদ্ধ গবেষণা প্রতিবেদনে যে ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছিল, তা সত্যিই বিশেষ উদ্বেগের। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক গবেষণা কর্মের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে। কোন গবেষণা কতটা নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ওই পদ্ধতি তার নির্দেশনা দেয়।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্যতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা সমকালে যাকে Competence

বলে সেই বিমূর্ত বিশেষ্যকে বহুবাচনিক পদে রূপান্তরিত করে বলে থাকেন Competencies। তা একদা ওই যোগ্যতাবলির সর্বপ্রথমটিতে উল্লিখিত ছিল,- সর্বশক্তিমান আল্লাহ-তালার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং মুসলিম/ অ-মুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যই তা প্রযোজ্য ছিল। লেখাপড়া না জানা, কখনো স্কুলে যাননি, এমন কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ-তালায় বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন জন্মাবধি। মানুষ এবং সমাজের প্রতি ভালবাসা এবং দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিষয় কোটি নিরক্ষর বাঙালি শিখে যায় স্বাভাবিক জীবনের নানান আচার-আচরণ থেকে। দেশপ্রেম, পরার্থপরতা এবং বিবিধ মানবিক গুণাবলী তারা শিখে নেন স্কুলের গণ্ডির মধ্যে পা না ফেলেই। এইসব prescribed competencies অর্জন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় উপাদান হতে পারে। কিন্তু যারা লেখাপড়া না শিখেই এসব যোগ্যতা অর্জন করেন, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী অনেকের চেয়ে আরো অর্থবহভাবে অর্জন করেন সমাজ-জীবন থেকে, মানব সম্পদের হিসেবে তাদের অবস্থানটা যে কোথায় সে বিষয়ে একটা গুণবাচক গবেষণা পরিচালনা করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

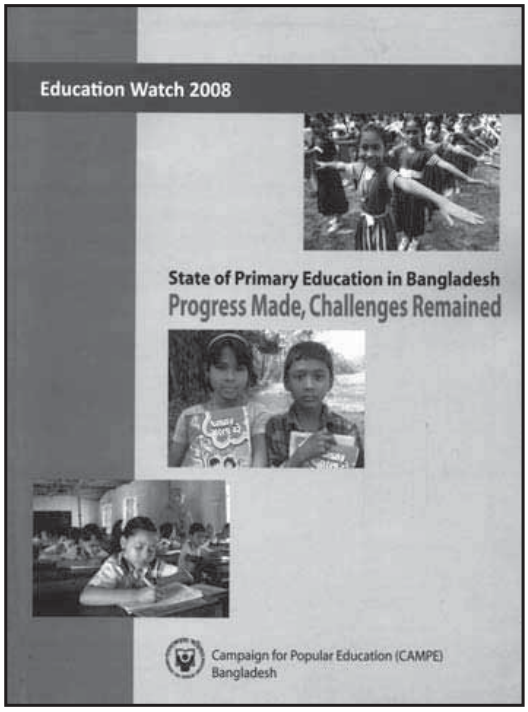

এনসিটিবি-র পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশিত আল্লাহ্তালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াও আরো অর্ধশতাধিক যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা ছিল এবং অনুমান করা যায় এগুলি সবই সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এগুলির অর্জনের ওপরই শিক্ষার মান নির্ভর করত। ওপরে আমাদের সাধারণ অ-শিক্ষিত জনসংখ্যা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি তার একটা তুলনামূলক সমীক্ষা সত্যিই করা যেতে পারে। *এডুকেশন ওয়াচ*-এর গবেষণায় বেরিয়ে এসেছিল যে, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত একটি অধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত একজন শিক্ষার্থী পড়তে পারে না একটি এমন বাস্তবতাকে নিশ্চিতভাবেই অর্জন বা মানের ঘাটতি বলে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু তা পারলেই যে শিক্ষার মান অর্জিত হয়েছে এমন প্রত্যয়নের বিপক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। সব ধরনের যোগ্যতার ক্ষেত্রেই তো Cognitive জ্ঞানের মুখ্য ভূমিকা থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, গ্রহণযোগ্য মাত্রার অর্জনসাপেক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী কোন একজন সমাজ উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখতে পারে তার বিপরীতে কোনরকমের লেখাপড়া না শিখে কৃষিকাজ করে অথবা শহরে গাড়ির গ্যারেজে শিশুশ্রমে নিয়োজিত কোন পিচ্চি বা আবদুল মানব সম্পদ হিসেবে প্রথমোক্ত জন অপেক্ষা অধিক মূলবান। নগরাঞ্চল যেসব শিশু বিভিন্ন কল-কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে, সমাজে প্রতিকূল বা অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার সঙ্গে তাদের নিত্যদিনের যোগাযোগের ফলে তারা পৃথিবী সম্পর্কে ভাল জানে, কাঁচাবাজারে গিয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবে, কোনটা পচা বা ভেজাল তা অধিকতর পারঙ্গমতার সঙ্গে শনাক্ত করতে পারবে। 'অ-শিক্ষিত' বলে এই সব 'ঝরে পড়া' শিশুদের অপাংক্তেয় করে রাখা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এ পর্যন্ত আমাদের দেশে বহুসংখ্যক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ বিচারে, এগুলির সবই হয়ত মূল্যবান এবং গবেষক/ গবেষক দল বা সংগঠনের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয়ও হয়ত মিলবে এগুলোর মধ্যে। কিন্তু প্রধানত এসব গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যাবে, শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার কর্মীরাই প্রধানত এমন নিবন্ধকার। কিন্তু এইসব প্রতিবেদন ও রচনা একসঙ্গে নিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, এর বিশাল অংশই তথ্যের পুনরাবৃত্তি। সুতরাং বিশ্লেষণ ও সুপারিশ বাতলানোর ক্ষেত্রেও সমরূপতা দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

অধিকাংশ গবেষকই গবেষণার একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন। শিক্ষা মানেই বিভিন্ন রকমের স্কুল, এন-সি-টি-বি, পি-ই-ডি-পি-১/২/৩ প্রভৃতি। এর বাইরে শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, সহজাত শিক্ষা, স্ব-শিক্ষা, গণমাধ্যম বা জনসংযোগ থেকে আহৃত শিক্ষা বিষয়ে এঁদের জানার বা বলার তেমন যেন কিছু নেই। শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা-পত্র রচনা চাকুরিজীবিকারই অন্যতম উপাদান ।

মনে পড়ছে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় একটি সচিত্র গল্প পড়েছিলাম। নীতিবাদী গল্প। এক অল্পবয়সী বালক দেখল যে, রেললাইনের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। হয়ত কাছাকাছি বাস করবার কারণে সে জানত যে, একটু পরেই একটা ট্রেন আসবে এবং দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। বালকটি বুদ্ধিমান, নির্ভীক ও

অবিচল। সে তখন তার হাতের আঙুল কেটে, সেখান থেকে ঝরে পড়া রক্তে তার রুমাল ভিজিয়ে নাড়তে লাগল। ট্রেনচালক দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে রেলগাড়ি থামিয়ে দিল। নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে বহু যাত্রী রক্ষা পেয়েছিল। সেই বালক স্কুল-শিক্ষার্থী হতেও পারে, নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ওই বালকের শিক্ষার্জনকে কোন্ উপায়ে যে পরিমাপ করা যাবে, শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত অনেক গবেষকই হয়তো তা বলতে পারবেন না।

এঁরাই আবার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে নানা সময় উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, আলাপ-আলোচনায় সেকথা উল্লেখ করে থাকেন। 'তোতা কাহিনী'-র কথা যদি ওঠে, তা হলে ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত করলেও ভাবতে হবে যে, লালন শাহ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না কি শিক্ষাবর্জিত? অক্ষরজ্ঞানহীন যে রিক্সাওয়ালা রাতের বেলায় তার রিক্সায় ফেলে যাওয়া কোন মানিব্যাগ বা হ্যাণ্ডব্যাগ পুনরায় দু'মাইল রিক্সা চালিয়ে যাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন, তিনি নিরক্ষর হতে পারেন, তিনি তথাকথিত 'শিক্ষাবঞ্চিত' হতে পারেন, কিন্তু তিনি কি শিক্ষাবর্জিত অথবা এনসিটিবি-ও সুনির্দিষ্ট Competencies বা যোগ্যতার অনেকগুলো কি স্বাভাবিক ও সামাজিকভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন নয়? আঙ্কিক পরিমাপের বাইরে সামাজিক পরিমাপের কথা কি ভাবা যায় না?

● ● ●

ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা কথা দেশের সর্বত্র ও বিদেশে বক্তৃতার সময় প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বলে থাকি এবং খুব জোরের সঙ্গেই বলে থাকি যে, আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের প্রথাগত অক্ষরজ্ঞান নেই সেকথা মানি, কিন্তু তাদের কোনভাবেই অশিক্ষিত বলা যাবে না। আমাদের লৌকিক পুরাণের অমর চরিত্র খনা কি স্কুলে অভিগম্যতার মধ্যে পড়েন, এ নিয়ে গবেষণা করে অনেকে ডিগ্রী অর্জন করেছেন। কিন্তু খনার বচনের বড় অংশই তো আমাদের কৃষিকাজ এবং আমাদের গ্রামীণ সামাজিক আচরণের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দেশের কৃষকরা তো অনাদি কাল থেকেই বীজ বোনা, সেচ দেয়া, ধান মাড়াই, গোলায় সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রায় সুচারুভাবে করে যাচ্ছে কোন স্কুলে বা কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া না করেই। ঝড়- বৃষ্টি-বন্যার সময় কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়, প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী যে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে, সেসব কলা কৌশল তারা জানেন disaster managment-এর ওপর কোন কোর্স না করেই। আধুনিক কালে নানারকম রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহারের বিধি তারা তো শিখে নেয় সহজে; নিরক্ষরতা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

লোকজ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে, তার মধ্যে কুসংস্কারের প্রচ্ছায়াও অনুপ্রবেশ করে সেকথা জানি, কিন্তু বাসক পাতা বা নিমপাতার যেসব অষুধ বা প্রতিষেধক অথবা হলুদ বা চন্দনের যে প্রসাধন চর্চা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে সমাদর লাভ করেছে, আমাদের পূর্ব পুরুষ/ নারীরা তার ব্যবহার করেছেন এবং তা বহু শতাব্দী আগে থেকেই, যখন নিরক্ষরতা, শিক্ষার মান বা অভিগম্যতার কোন ধারণাই লৌকিক সমাজে তৈরি হয়নি। আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এখনও আলঙ্কারিক অর্থে শিক্ষার 'আলো' থেকে বঞ্চিত, কিন্তু জীবনের নানা ধরণের প্রতিকূলতা বা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে তারা পিছপা হন না। এরা কি সর্বদাই গবেষণার বাইরে থেকে যাবে? তাদের জীবনদক্ষতা, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রায়োগিক শিক্ষা পরিমাপ করার উদ্যোগ কখনো নেয়া হবে না?

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনকে সম্মিলিত করে দেখার একটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে কতটা দক্ষতা অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে অজস্র গবেষণা-কর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষায় অভিগম্যতার বাইরে থেকে গেল, তারাও যে অনানুষ্ঠানিকভাবে দক্ষতা অর্জন করে সমাজে টিকে আছে, তাদের কৃতিত্বের কি কোন পরিমাপ করার চেষ্টা নেয়া যায় না? জাতীয় অর্থনীতিতে informal sector-এর অংশ বা অবদান বিষয়ে নানা কথা বিভিন্ন সময় শোনা যায়। ওই sector-এর কর্মীরা প্রধানত বিদ্যালয়ের শিক্ষার অভিগম্যতার বাইরে। তাই লক্ষ লক্ষ শিক্ষাবঞ্চিতরা কিভাবে সমাজ উন্নয়নে সাহায্য করছে, তার তথ্য তো জানা দরকার।

আলোচনায় বা প্রবন্ধ রচনার সময় শুধু জোর গলায় একথা বললে চলবে না যে, পোশাক-শিল্পের বিশাল (এবং ব্যাপকভাবে শিক্ষাবঞ্চিত) কর্মীবাহিনী, কৃষি-কাজে নিয়োজিত (প্রধানত নিরক্ষর) শ্রমিকবৃন্দ এবং বিদেশে কর্মরত (অধিকাংশই স্বল্পশিক্ষিত, মানসম্পন্ন শিক্ষা বা Competencies অর্জনে ব্যর্থ অথবা একদা সাক্ষর কিন্তু পরবর্তী কালে চর্চার অভাবে পুনর্নিরক্ষর) তরুণদের স্বেদসিক্ত মজুরি ও শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমসাময়িক বাংলাদেশের অর্থনীতি। প্রকৃতপক্ষে, এমন একটা গবেষণা হওয়া দরকার, এই যে এত 'শিক্ষা আমার প্রথম চাওয়া' বলে দেশের সীমানা-বিদারী স্লোগান-বিস্তারী দাবি তুলছি, সেই কথা মনে রেখে তথ্য-পরিসংখ্যান বার করতে হবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষিত জনসংখ্যার না কি শিক্ষা-বিহীন আম-জনতার অবদান বেশি।

এর মানে এই নয় যে, শিক্ষা বিস্তারের বা শিক্ষার মান উন্নয়নের যে অভিযান ও সামাজিক উদ্যোগ তার তাল-লয় বিলম্বিত করতে হবে। আমি যেকথাটার ওপর জোর দিতে চাইছি তা

হলো, অ-শিক্ষিত গণমানুষকেও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাড়ি পাল্টানোর সময় গ্রাম থেকে নদী ভাঙনে ছিন্নমূল 'অ-শিক্ষিত' জনসংখ্যার অংশ যেসব ভ্যানওয়ালা নিপুণ কৌশলে সাজান বিভিন্ন আকৃতির বিবিধ জিনিসপত্র এবং সেসব যেভাবে তারা আদ্যিকালের আধা-যান্ত্রিক গাড়িতে ভরে নেন এবং সততার সঙ্গে সবকিছু বুঝিয়ে দেন, আবার নতুন বাড়িতে মাপজোখ করে ঠিকঠাক সাজিয়ে দেন, তার দক্ষতার কোন হিসেব-নিকেশ থাকবে না ? স্কুলের গণ্ডির বাইরে থেকে যাওয়া যে তরুণ তারই মত একজন 'অ-শিক্ষিত' ওস্তাদের কাছ থেকে কাজ শিখে এখন বনেদী এলাকার উচ্চশিক্ষিত কোন ব্যক্তির বাড়ির শীতাতপনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন সামগ্রী যেমন ফ্রিজ বা এয়ার কণ্ডিশনার ঠিক করে দিয়ে আসেন, যা আবার ওই ব্যক্তির সম্মান শ্রেণীতে পদার্থবিজ্ঞান পড়ুয়া ছেলে/মেয়ে করতে পারে না, এইসব দক্ষতা বা শিক্ষার যদি আনুষ্ঠানিক তথ্য-পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ গবেষণা না হয়, তা হলে সমাজ উন্নয়নের অংশীদার এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের স্বীকৃতি বা কৃতজ্ঞতার কোন আনুষ্ঠানিক প্রমাণ থাকে না, এদের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জানি, এই কাজটা বেশ জটিল, কঠিন। সত্য তো কঠিন, সেই কঠিনকেই ভালবাসতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সহজ পথের অভিগম্যতা, অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক পড়ার দক্ষতা, মান অর্জন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তো কম হল না। দেশের সমাজ-অর্থনীতির বড় পরিবর্তন না হলে এখানেও কোন ফলের তারতম্য হবে না। গবেষণার কঠিন পথে পা ফেলার উদ্যোগ এখন গ্রহণ করা দরকার। বুঝি, এসব প্রথাবিরোধী, ব্যাপকভাবে শ্রমসাধ্য এবং অনন্যসাধারণ দায়বদ্ধতা দাবি করা এমন ধরনের গবেষণা-কর্মে নিয়োজিত হতে বেসরকারি সংস্থার শিক্ষা উন্নয়নকর্মী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষর্থীরা প্রবলভাবে আগ্রহী বোধ করবেন না।

কিন্তু প্রায় আড়াই দশক ধরে চলে আসা আমাদের দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সুসংস্পৃক্ত ও কর্মমুখী করার যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমের সামাজিক অভিঘাত এবং উপযোগিতা বিষয়ে অথবা সরকারি বিনিযোগের ফলাফল সমীক্ষা বিষয়ে কী কোন শ্রমনিবিড় ও পরিসংখ্যানসমৃদ্ধ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে? বড়ো আশা করে তো National Academy of Primary Education (NAPE) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল নিয়ে ছোটখাট কত প্রতিষ্ঠান তো নিত্যই নানা গবেষণা হাজির করছে। NAPE এক্ষেত্রে কি ধরনের অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে, তা নিয়ে কি তথ্যনির্ভর গবেষণা করা যায় না? প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনসটিটিউট নিয়ে কিছু গবেষণার খোঁজ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অত্যন্ত অপ্রতুল। সব গবেষণাতেই প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়, কিন্তু এই প্রশিক্ষণ জাতীয়ভাবে বাস্তবিক অর্থে শিক্ষার মান বাড়াতে কতটা সহায়তা করেছে, তা নির্ভুল ও নিরাবেগভাবে পরিমাপ করার জন্য গবেষণার কি কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই? এ বিষয়ে পেশাজীবী গবেষকবৃন্দ এগিয়ে আসছেন না কেন?

প্রাথমিক/ মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে যে কোন আলোচনা-সভায় কত শত ব্যক্তি কত সহস্র বার যে দেশে প্রচলিত প্রায় দশ/বারো রকমের শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির কথা বেশ সমালোচনা বা নিন্দার সঙ্গে উল্লেখ করেন, তার হিসেব মেলানো ভার। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা শহর ও মফঃস্বলের হাজারো তথাকথিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহে শুধু পদ্ধতিগত ভিন্নতা নয়, পাঠ্যবস্তুর ব্যাপক তারতম্য রয়েছে, সেসব নিয়ে গবেষণার প্রতি আগ্রহ এত কম কেন? শুধু মুখরোচক শব্দে এসব বৈষম্যের কথা বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে গালমন্দ করেই কি আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করব? সারাদেশে কোচিং বাণিজ্যে কত কোটি টাকার লেনদেন হয়, তার সুচারু গবেষণা কেন হচ্ছে না? কোচিং নামের শিক্ষাপ্রযুক্তি কেন্দ্রের সংখ্যাধিক্য শিক্ষাব্যবস্থায় যে money এবং muscle -কে ক্রমবর্ধমান সুসংগঠিত বিকল্প কিন্তু অশুভ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, প্রায়োগিক গবেষণা বা action research হিসেবে এই ক্ষেত্রটিকে আমরা বেছে নিচ্ছি না কেন? এরকম আরো বহু এলাকা আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লেখাপড়া নিয়ে আজকাল আর কানাঘুষা হয় না, তা নিয়ে প্রকাশ্য রসিকতা এখন আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার অংশ। আর আমরা কি না সেই অতি চর্চিত অভিগম্যতার তথ্যের ভিন্নতা, মেয়েদের বাল্যবিবাহ আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা এবং মানসম্মত শিক্ষার অভাব বিষয়ে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছি, পুনর্কথনের অভিযোগ মাথায় নিয়ে।

জিডিপি-র একটা নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখার জন্য ইউনেস্কোর একটা নির্দেশনা আছে। অনেক দেশ তার কাছাকাছি বরাদ্দ রাখলেও, বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে এবং তাও কিনা এদেশের তুলনায় গরিব দেশের চেয়ে? বেসরকারি সংস্থা, দক্ষ-অদক্ষ নিবেদিতপ্রাণ ও ফাঁকিবাজ শিক্ষককুল এ নিয়ে দাবি তুলতে চির সোচ্চার চির অক্লান্ত। মনে আছে, একটি সভায়, যেখানে ভারি ভারি সব মানুষ, প্রাক্তন মন্ত্রী, অমাত্য, আমলা, সাংসদ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বেরসিকের মতো একটা প্রশ্ন তুললেন। আচ্ছা, শিক্ষায় ওই বরাদ্দটা দিতে হলে অন্য খাত থেকে কেটে দিতে হবে, তা হলে সেগুলো কী কী খাত হতে

পারে? প্রায় নিরুত্তর শ্রোতৃমন্ডলীর একজন পরে বলেছিলেন, সামরিক খাতে বরাদ্দ কমানো যেতে পারে। সেটা যে করা যায় না, বোদ্ধা সমাজের সবাই তা জেনে ও মেনে কথাটা যুক্তিযুক্তভাবে উপেক্ষা করে গেলেন।

● ● ●

আমার এই নিবন্ধের অভাজন ও সম্ভাব্য সুশিক্ষিত পাঠকদের কাছে একটা সবিনয় আবেদন পেশ করছি। আপনারা কি ঢাকা শহরের বা মফঃস্বল শহরের সরকারি হাসপাতালে গেছেন সাম্প্রতিক কালে? শত শত রোগী, সে বর্হিবিভাগের হোক অথবা হাসপাতালে যারা ভর্তি আছেন, তারা যে কিভাবে চিকিৎসা সেবা পান, তা দেখলে আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে শিক্ষার চেয়ে আগে এবং আরও বেশি হারে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া উচিত। এইসব সরকারি, হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র অমানবিকতার মূর্ত ও কুৎসিত কেন্দ্র।

জিডিপি-র এই অত্যধিক প্রয়োজনীয় বিষয়টাকে আমি খাটো করে দেখছি না। অবশ্যই শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আমরা বাজার-ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল-কিনিক, কুরিয়ার সার্ভিস, ব্যাংক-ইনসিওরেন্স এমনকি বিমান পরিবহন, আগ্রাসী টেলিযোগাযোগের সেবার জন্য নির্দ্বিধায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার বা প্রতিরোধ করার কোন উপায় নেই। আবার একই সঙ্গে 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার' এমন দাবির পক্ষে প্রায়-সহিংস আন্দোলন গড়ে তুলি। স্বাধীনতা লাভের পরে বিগত চার দশকে দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বিপুলভাবে বেড়েছে, অবকাঠামোগত খাতে বহু কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অবশ্যই মানতে হবে, প্রমিত চাহিদার চেয়ে তা অনেক কম। এই চার দশকে সোনার দাম বেড়েছে বহু গুণ, বাঙালির প্রধান খাদ্য চালের দাম বেড়েছে, যে ভাড়া দিয়ে একদা ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাওয়া যেত, মাণিকগঞ্জ যেতেও এখন তার চেয়ে বেশি টাকা ভাড়া গুণতে হয়। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বা হলের আবাসন ফি বাড়ানো যায়নি। বাড়ানো যায় না। দেশের সব প্রধান সড়ক তখন বন্ধ হয়ে যায়। সহিংসতা ফুঁসে ওঠে।

আচ্ছা, এরকম একটা গবেষণা চালানো তো কষ্টসাধ্য নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আগে হাজারো শিক্ষার্থী যেসব কলেজে পড়তো, সেখানে তারা মাসিক টিউশন ফি এবং বাৎসরিক অন্যান্য ফি দিতো কি পরিমাণে। এই গবেষণার ফলাফল আমাদের দেশের শিক্ষার্থী জনসংখ্যার মনস্তত্ত্বে বড় রকমের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবে, অতটা উচ্চাশা করছি না। কিন্তু সমান্তরাল একটা গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। দেশে বর্তমানে যে ৭৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, শিক্ষার্থীপ্রতি তারা কত টাকা আদায় করে; তা থেকে একটা ভিন্ন ধরনের তুলনাতত্ত্ব, যেটাকে গবেষকবৃন্দ বলে থাকেন Comparability, তার একটা বাস্তব ধারণা পাওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ যাবতীয় শিক্ষার ভিত্তি, একথা তো অনস্বীকার্য, তাই মানের ব্যাপারে এক্ষেত্রে অনেক মনোযোগী হতে হবে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিংহভাগের হিসেব নিলেই বোঝা যাবে, এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অভিধানে 'মান' বলে কোন শব্দের অস্তিত্বই নেই। এইসব এলাকা কি গবেষণা পরিচালনার জন্য নিতান্তই অর্থহীন? গবেষণা চলুক না এইখানে।

মনে পড়ে, পাকিস্তানী আমলে শিক্ষা আন্দোলন এমনকি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের জোর দাবি ছিল, ক্যাডেট কলেজ উৎখাত। বিভক্তি ও বৈষম্যমূলক শিক্ষার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ বিলুপ্তি তো হয়ইনি, বরং ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন পরবর্তীকালে এমন কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ, দেশের সকল ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী পিছু খরচ কত, শিক্ষকদের বেতন ও আবাসিক ব্যবস্থা, ওই শিক্ষার নেতৃত্ব কায়েমকারী বাহিনীর অধীনস্থ থাকা সর্বমোট ক্যাডেট কলেজ দেশের কত একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলসমূহের গড় জমি কত। ক্যাডেট শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কি জানে, এজন্য কাঠামোভুক্ত এবং উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করে গবেষণা করা যায় না? তাতো হচ্ছে না, অথচ ওই একতারার অভিগম্যতা, ঝরে পড়া, মান প্রভৃতি নিয়ে আমরা অক্লান্ত।

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দক্ষতা নিয়ে খুবই সুপরিকল্পিত প্রশ্নপত্র তৈরি করে হাজার দশেক শিক্ষকের যোগ্যতার একটা পরিমাপ করা যায় না ? প্রয়োজনে নিশ্চয়ই করা যায়। তাদের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত শিক্ষা ও যোগ্যতা, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিষয়ে কি গবেষণা চালানো যায় না? পরিণামে সেটা একটা সত্যিকারের বড় কাজ হতে পারে। পরিশেষে, আবদুল্লাহ আবু সাইয়ীদকে স্মরণ করি। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের কালে স্কুলগুলো ছিল কাঁচা এবং [এমপিও ভুক্ত নয়] কিন্তু শিক্ষকগণ ছিলেন বেশ পাকা। একালে স্কুলভবনগুলো পাকা, কিন্তু মাস্টারমশাইরা কাঁচা।' এমন একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এমন মোক্ষম প্রবচনের পরিপ্রেক্ষিতে হোক না একটা গবেষণা।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শা ও য়া ল খা ন

সাক্ষরতা ও শিশুচর্চায় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভের ভূমিকা

গ্রন্থাগার শব্দের আভিধানিক অর্থ পুস্তকাগার, পাঠাগার, লাইব্রেরি। এক কথায়, গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পুস্তক সংরক্ষণ, পুস্তক পাঠ ও আদান প্রদান করা হয়। আর আর্কাইভ শব্দের আভিধানিক অর্থ মহাফেজখানা, সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিলপত্র সংরক্ষণের স্থান। এই দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থেই নিহিত আছে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। আমরা জানি বই মানুষের মনের দুয়ার খুলে দেয়, জ্ঞানকে প্রসারিত করে, চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে। বিবেকের শক্তি যোগায়, অর্জিত বিদ্যাকে সতেজ রাখে, সাক্ষরকে নিরক্ষরে পরিণত হতে বিরত রাখে। আর দলিল দস্তাবেজ, তথ্য-উপাত্ত মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, সত্যকে সামনে তুলে ধরে। এক কথায় গ্রন্থাগার এবং আর্কাইভ জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লাইব্রেরি আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইউরোপের সামাজিক অবস্থা যখন নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করছিলো, সমাজবিদগণ তখন লাইব্রেরির মাধ্যমেই মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্যে তারা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঘরে ঘরে বই সরবরাহ করে তৎকালীন অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত লোকজনকে বই পড়ায় উৎসাহিত করা হয়েছিলো। পাঠক সৃষ্টি এবং পাঠক ধরে রাখার জন্যে এক থেকে অন্য লাইব্রেরিতে পালাক্রমে বদল করেও বই সরবরাহ করা হতো। এতে বইয়ের স্বল্পতা সত্ত্বে পাঠক একই বই বারবার পড়ার একঘেঁয়েমি থেকে রক্ষা পেতো।

বয়স্ক সাক্ষর বা বয়স্ক নব্য সাক্ষররা কিন্তু শিশু নয়। কাজেই তাদের বয়স এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই তাদের সাক্ষরতা চর্চার শিক্ষা উপকরণ আমাদের দরকার। কিন্তু বাজারে বা প্রতিষ্ঠিত সব গ্রন্থাগারে শিশুদের উপযোগী সহজ বই পুস্তক থাকলেও বয়স্ক নব্য সাক্ষর যারা মাত্র পড়তে শিখেছে, তাদের শিক্ষা চর্চার বা তাদের সাক্ষরতাকে বজায় রাখার উপকরণের অভাব গুরুতর। এ বিষয়টি গ্রন্থাগার বিষয়ক কর্তৃপক্ষের আমলে আনা জরুরি। কারণ নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা চর্চা এবং অব্যাহত শিক্ষা চর্চা বজায় রাখতে লাইব্রেরির গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি আমাদের শিশু শিক্ষার্থীদেরও গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত।

যে কোন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিন্নভাবে অবস্থান করলেও গ্রন্থাগার নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, বহুবিধ তথ্যসমৃদ্ধ একটি মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য দরকার দক্ষ, যোগ্য এবং বই-প্রেমিক গ্রন্থাগারিক। অন্যথায় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে না। ফলে গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। গ্রন্থাগারে বই শুধু সাজিয়ে রাখা হয় না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুছিয়ে রাখা হয়। বই বাছাই করে কেনা থেকে শেলফে গুছিয়ে তোলা পর্যন্ত যে কার্যপরম্পরা তা বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা। গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চা করার, বিদ্যা অর্জন করার, শিক্ষা চর্চা করার সুযোগ দেয়। শিক্ষাব্যবস্থার প্রারম্ভিক স্তরে যদি গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হতে না

পারে, উচ্চ শিক্ষায় বা প্রাত্যহিক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনুভব করতে না পারে, তবে তাদের শিক্ষা অনেকখানি অপূর্ণই থেকে যায়।

এই অপূর্ণতা কিছুটা হলেও লাঘব করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী লাইব্রেরির ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত স্থান, পর্যাপ্ত কক্ষ সংখ্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী, বই, লাইব্রেরি শিক্ষক এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে বলা আছে স্কুলে একজন শরীর চর্চাবিদ শিক্ষকও থাকবেন। এই নিয়ম কলেজ, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা সবখানেই প্রযোজ্য। তবে কলেজ লাইব্রেরির জন্য লাইব্রেরি সায়েন্স ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন গ্রাজুয়েট লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। কলেজ লাইব্রেরিতে পঠিত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইসহ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকার বই থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল লাইব্রেরিতেও তাই। তবে এখানে ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকার বই থাকতে হবে। মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রকাশিত বা বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যবইসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ পুস্তক এবং রেফারেন্স বই থাকতে হবে।

সরকারি বা অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগার আমাদের হতাশ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সাধারণত একটি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো বসার জায়গা পায় না। ফলে ধীরে ধীরে বই পড়ার আগ্রহ কমতে থাকে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা বইভিত্তিক বা গ্রন্থাগার নির্ভর না হয়ে গাইডসর্বস্ব মূলের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের মানতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সব শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটা নির্ভরযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অব্যাহত শিক্ষাচর্চার উন্মুক্ত ক্ষেত্র।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সংস্পর্শে আসার সুবিধা থাকে। তাই মানুষের জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। এক কথায়, গ্রন্থাগারের ব্যবহার অব্যাহত শিক্ষাচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যা মানুষকে বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্ত করে তোলে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ক্যাটালগ ব্যবহার করতে পারা। ক্যাটালগই বলে দিবে পাঠক কোথায় কিসের সন্ধান পাবে।

গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর গ্রন্থাগারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: সংহত গ্রন্থাগার এবং ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার। যে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমিত থাকে তাকে সংহত গ্রন্থাগার বলা হয়। যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ ও বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ নয় তাকে ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার বলা হয়। আবার গ্রন্থব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে গ্রন্থাগার দুই রকমের– সংরক্ষিত ও উন্মুক্ত। যে গ্রন্থাগার বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে, তাকে সংরক্ষিত গ্রন্থাগার আর যে গ্রন্থাগার সকলের জন্য খোলা, প্রবেশাধিকার সীমিত নয় তাকে উন্মুক্ত গ্রন্থাগার বলে। গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন: ব্যক্তি বা পারিবারিক গ্রন্থাগার, স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি গ্রন্থাগার, স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার, বিভিন্ন অফিস আদালতের গ্রন্থাগার– দাফ্তারিক গ্রন্থাগার, সাধারণের গ্রন্থাগার (পাবলিক লাইব্রেরি), ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইত্যাদি।

ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাতিষ্ঠানিক কারণে গ্রন্থাগারের নাম বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, স্কুল গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ইত্যাদি। আকার আকৃতি বা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও সব ধরনের গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য অভিন্ন, বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান চর্চা, তথ্য-উপাত্তের সংরক্ষণ। ঢাকায় সাধারণের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে রয়েছে পাবলিক লাইব্রেরি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে বড় বড় গ্রন্থাগার। যেমন– নারায়ণগঞ্জের সুধীজন পাঠাগার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের রয়েছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর স্ব-উদ্যোগে একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তুলে ছিলেন, যা খুবই সমৃদ্ধ।

গ্রামে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার বলা হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারসমূহ গ্রামের মানুষের পঠন চাহিদা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত। এখানে ছাপানো বইপত্র, সাময়িকী, প্রতিবেদন, শ্রুতি-দর্শন উপকরণ ইত্যাদি সংরক্ষণ, সংগ্রহ এবং সেগুলো পঠনের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রামীণ মানুষের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামের মানুষের শিক্ষা ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বইপত্র এবং অন্যান্য পঠন সামগ্রী রাখা হয়।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার সাধারণত ব্যক্তিগত, স্থানীয় বা বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রামের মানুষের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে নানা ধরনের গ্রামীণ গ্রন্থাগার রয়েছে। যেমন– গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র, গণকেন্দ্র, গ্রামীণ পাঠচক্র, মসজিদ পাঠাগার, গ্রামীণ পাঠাগার, লোককেন্দ্র, কমিউনিটি লাইব্রেরি ইত্যাদি। গ্রামের স্বল্পসাক্ষর, নব্যসাক্ষর ও সাক্ষরদের পঠন চর্চা অব্যাহত রাখতে এসব গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র একটি নতুন ধারণা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের মিলনকেন্দ্র বা মিলন মেলা। মূলত সাক্ষরতা-উত্তর সাক্ষরতা চর্চাকারীদের কেন্দ্র। যেখানে নব্য সাক্ষররা দক্ষতা

অর্জন করার সুযোগ পায়, যা জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক হয়। সাক্ষরতা চর্চাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারীদের জন্য এই গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এসব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় সীমিত আকারে।

১৯৪৯ সালে ইউনেস্কো গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করে প্রতিটি দেশের প্রতি ১ বর্গমাইল ব্যাসার্ধের এলাকার মধ্যে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপনের সুপারিশ করেছিল। বাংলাদেশে এ সুপারিশ এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষরতা অর্জন বই পড়ার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আবার অর্জিত সাক্ষরতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ক্রমে মানুষ তা ভুলতে বসে। এমনটা ঘটলে বইয়ের সংস্পর্শে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজন নিরক্ষরকে ছয় মাসে কার্যকর সাক্ষর করা সম্ভব। কিন্তু একজন কার্যকর সাক্ষর তিন মাস সাক্ষরতা চর্চা না করলে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিরক্ষরে পরিণত হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণগ্রন্থাগার বা গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র শিক্ষা এবং সাক্ষরতা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বই ছাড়াও পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগার সংগ্রহে রাখে জার্নাল, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, শিক্ষাসহায়ক অন্যান্য উপকরণ। সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। এ দর্পণে চোখ রাখলে কোন সাক্ষরই পুনরায় নিরক্ষর হতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

সাক্ষরতা অর্জন বই পড়ার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আবার অর্জিত সাক্ষরতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ক্রমে মানুষ তা ভুলতে বসে। এমনটা ঘটলে বইয়ের সংস্পর্শে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজন নিরক্ষরকে ছয় মাসে কার্যকর সাক্ষর করা সম্ভব। কিন্তু একজন কার্যকর সাক্ষর তিন মাস সাক্ষরতা চর্চা না করলে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিরক্ষরে পরিণত হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণগ্রন্থাগার বা গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র শিক্ষা এবং সাক্ষরতা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বই ছাড়াও পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগার সংগ্রহে রাখে জার্নাল, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, শিক্ষাসহায়ক অন্যান্য উপকরণ। সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। এ দর্পণে চোখ রাখলে কোন সাক্ষরই পুনরায় নিরক্ষর হতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত কোয়ালিটি এডুকেশনের প্রথম নির্দেশনা Learning to learn। কাজেই শেখার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারই হচ্ছে শেখার এবং শিক্ষা চর্চার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। একজন মানুষকে তার তার দেশ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সামাজিক অর্জন সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়, এটি তার শৈশব পাঠশালা। কিন্তু স্বদেশ, বিদেশ তথা গোটা বিশ্বের সাথে মনোযোগাযোগ এবং সামাজিক/বৈশ্বিক যোগাযোগ স্থাপনের পথ হল বিচিত্র গ্রন্থ আর দৈনন্দিন/সমসাময়িক পত্রপত্রিকার সম্ভার গণগ্রন্থাগার। গণগ্রন্থাগারে আছে অসংখ্য জ্ঞানীগুণী শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিকের অমূল্য বাণী যা নীরবে কথা বলে পাঠকের অন্তর জুড়ে।

মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রচেষ্টা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর্থিক সঙ্গতির সাথে এর রয়েছে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী জন মারসম্যান ১৯৯৭ সালে তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রমাণ করেন যে, উন্নত বিশ্বের তথ্য প্রবাহ জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে ২-২.২৫% অবদান রেখে থাকে। আর উন্নয়নকামী দেশে সঠিক ও অবাধ তথ্য প্রবাহ ১-১.৫% অবদান রাখতে সক্ষম। লাইব্রেরি অতি সহজে তথ্যের অবাধ ও নিরপেক্ষ চলাচলকে সম্ভবপর করে তোলে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছে। এক কথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে মাত্র, কিন্তু লাইব্রেরি তাকে সুশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আবার শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, উন্নয়নের পূর্বশর্ত সুশিক্ষায় সহায়তার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকেও মুক্ত করা সম্ভব। বর্তমান ও অতীতের উন্নত সভ্যতার দিকে তাকালে জীবনমান উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে উঠে। আমেরিকার প্রতিটি নাগরিক সপ্তাহে অন্তত দু'দিন লাইব্রেরি ব্যবহার করে। সে কারণেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ লাইব্রেরি 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' গড়ে উঠেছে আমেরিকার ওয়াশিংটনে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার লালনক্ষেত্র মিশর, ইরাক, কর্ডোভা প্রভৃতি দেশেও গড়ে উঠেছিল তৎকালীন বিশ্বের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিসমূহ। যুদ্ধবিজয়ী মুসলিম সেনানায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধানরা বিজিত দেশের বই-পুস্তক ধ্বংস করতেন সব কিছুর আগে।

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। বই চিন্তায় সহায়ক একটি উপকরণ। লেখনীর মাধ্যমে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সম্প্রসারণ ঘটে। আর শিক্ষা ও চিন্তার বাহন বইয়ের অবস্থান স্থল গ্রন্থাগার। জ্ঞান অর্জন এবং দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে

গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কুয়ানৎস সঙ্গত কারণেই বলেছিলেন, ''যদি এক বছরের পরিকল্পনা মতো ফল পেতে চাও, শস্য বপন কর, যদি সমগ্র জীবনের জন্য পরিকল্পনা করে ফল পেতে চাও তবে মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা কর।'' আমাদের সাক্ষরতা কার্যক্রমকে সফল করতে হলে অব্যাহত শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে হবে। গ্রন্থাগার অব্যাহত শিক্ষা চর্চার একটি বিশাল ক্ষেত্র। সুতরাং সাক্ষর, নব্যসাক্ষর সবাইকে গ্রন্থাগারে নিতেই হবে। গ্রন্থাগারকে মানুষের কাছে যেতেই হবে। অন্যথায় দেশের নিরক্ষরতা মুক্তি ঘটবে না শত চেষ্টাতেও।

আরকাইভস একটি দেশের ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সংরক্ষণাগার। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে আরকাইভসের প্রচলন ছিল। তবে আধুনিক আরকাইভসের জন্ম হয় অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসি বিপ্লবের সময়। সর্বপ্রথম জাতীয় আরকাইভস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে। সে দেশেই ১৭৯৬ সালে প্রাদেশিক আরকাইভস প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ করে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আরকাইভস যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, তা পরবর্তীকালে বিশ্বেও বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয় আরকাইভস প্রতিষ্ঠিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ব্রিটিশ শাসন প্রর্বতনের পরেই প্রশাসনিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নতুন নতুন বিভাগ ও দফতর প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক, রাজস্ব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯১ সালে কলকাতায় 'ইসএপরিয়া রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ডিপার্টমেন্টই পরবর্তী কালে 'ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইন্ডিয়া' নামে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'ডাইরক্টরেট অব আরকাইভস এন্ড লাইব্রেরি'র অধীনে ১৯৫১ সালে করাচিতে ন্যাশনাল আরকাইভস অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ঢাকায় 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর'-এর অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের সকল ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্র, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ ইত্যাদি সংগ্রহ, দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করছে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস। এক কথায়, বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আমাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আকর তথ্যবাহী মূল উপাদানের সংরক্ষণাগার, গোটা জাতির স্মৃতি বিজড়িত তথ্যের ভান্ডার, জাতির শেকড়ের সন্ধানদাতা।

জাতীয় আরকাইভসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংরক্ষিত সকল নথিপত্রের নিরাপত্তা বিধান এবং রেফারেন্স ও গবেষণা কাজে সুযোগ প্রদান এবং সরকারের সকল নথিপত্রের আইনগত সংরক্ষক হিসেবে কাজ করা। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ করা, আধুনিক ও যথাযথ নথি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের প্রধান বিভাগসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন, নথি ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, মাইক্রোফিল্মিং/রিপোগ্রাফি, স্টাফ ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ, প্রদর্শনী, ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ এবং ডিজিটালাইজেশন।

জাতীয় আর্কাইভস আগারগাঁয়ের ৩২, বিচারপতি এস এম মোর্শেদ সরণিতে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কর্মদিবসে সরকারি অফিস সময়সূচি অনুযায়ী খোলা থাকে এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে। জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্র দেশের গবেষক, প্রশাসক, সাংবাদিকসহ সাধারণ মানুষ এবং বিদেশী বৈধ গবেষকের গবেষণা কাজের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র সংরক্ষিত আছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত জাতীয় আরেকাইভসে সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্রের সন্ধান ও সংগ্রহ কাজ চলছে। গ্রন্থাগার এবং আরকাইভস সাক্ষরতা বজায় রাখা এবং শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে নয় শুধু, দূর অতীত, নিকট অতীত, বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞানার্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম।

জাতীয় আর্কাইভস কি এবং কেন এ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিজের অতীত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ তথা শেকড়ের সন্ধান পেতে আর্কাইভস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাথমিক স্তরেই আমাদের শিশুরা জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে পড়ার সুযোগ পায় বলেই শিশু কিশোরদের মানসপটে এসব বিষয় সজাগ থাকে অর্থাৎ এ সব বিষয়ে তারা প্রাথমিক জ্ঞান রাখে। সময় সুযোগ পেলে শিশু কিশোররা এসব প্রতিষ্ঠান দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং দেখে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করে। এসব বিবেচনায় রেখে জাতীয় আরকাইভস সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ বিষয়টা পাঠ্যপুস্তক কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত। এ ছাড়া শুধু ঢাকায় নয় বিভাগীয় শহরেও আরকাইভস থাকা প্রয়োজন।

শাওয়াল খান

কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষক

মো. জাকির হোসেন

মানসম্মত শিক্ষা: শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ, বলা হয়েছে, "সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক।" কার্যত শিক্ষক জন্মান না, গড়ে ওঠেন, কিংবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হন। বস্তুত শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার রূপকার ও শিল্পী। বিজ্ঞজনদের অভিমত হল, কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই তার শিক্ষকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, যে কোন মূল্যে আমরা আমাদের শিশুদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক সংগ্রহ করব। ফলত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা গবেষণা, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। এটি যে জাতি যতো আগে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে; তারা ততো আগেই এ খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করেছে। এ বিনিয়োগের ফসল দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষক। আর এ শিক্ষকেরাই গড়ে তোলেন দক্ষ মানব সম্পদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা তাঁর কাছে নিরেট জ্ঞান অর্জন নয়; বরং মানুষকে সম্পদে রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্যের সব শিক্ষকের বেতন সরকারী ট্রেজারি থেকে প্রদান করতেন। মুঘল বাদশাহ আকবর বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে শাসনভার গ্রহণ করে উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের সুপারিশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৯০৭ সালে কলকাতায় ডেভিড হেয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ১৯০৯ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ সময় আসাম, বিহার, ত্রিপুরা থেকে শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আসতেন। এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষদই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অনুষদ। তখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে ৪টি নর্মাল স্কুল ও ১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ দায়িত্ব পালন করত। ১৯৪৭ সালের পরে মাওলানা আক্রাম খানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে দেশে ৪৭টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪টি হয়। তবে ১টি বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যে কোন দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি হচ্ছেন-সুদক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। শিক্ষানীতি ২০১০-এ, শিক্ষক প্রশিক্ষণে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে যে, দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যা প্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বস্তুত এমন পরিস্থিতিতে মানসম্মত কিংবা গুণগত শিক্ষা সুদূরপরাহত। এমন বেহালদশা হতে মুক্তি লাভের উপায় কী? নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা। শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা। ১৯৯৭ সালে আমাদের দেশে ৫৩টি সরকারি প্রাথমিক ও ১১টি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল। শিক্ষানীতি ১৯৯৮ বাস্তবায়নে (১৯৯৮-২০১০) দেশে নূতন ১১টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যয় ধরা হয়েছিল ১১০ কোটি টাকা। প্রত্যেকটি স্থাপনের ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে ১০টি নূতন মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যয় ধরা হয় ১০০ কোটি টাকা। বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১৪টি সরকারী ও ১১৭টি বেসরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। কয়েকটিতে বি.এড ডিগ্রী ছাড়াও এম.এড ডিগ্রীও প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের নামমাত্র বৃত্তি প্রদান করা হয়। ফলে উৎসাহও উদ্দীপনাসহকারে শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয় না। আর তা-ও আবার গতানুগতিক। অনুরূপ ডিগ্রী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও দেয়া হয়। শিক্ষা একটি অবিরাম চলক। এ চলকের সার্থক ও সফল বাস্তবায়নকারী শিক্ষক। ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ অপরিহার্য।

দক্ষিণ-পূর্ব তথা পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে রয়েছে শিক্ষা বিনিয়োগ। জাপান ১৯০০ সালেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করেছে। দঃ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, হংকং, চীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে।

শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করেছে।

প্রশিক্ষিত শিক্ষকের নিষ্ঠা, আস্থা, বিশ্বাস, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সেবাধর্মী মন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে, শিক্ষাগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ সামাজিক পুঁজি তৈরির হাতিয়ার। মানুষ তৈরির নৈতিক অনুপ্রেরণা। প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষিত শিক্ষক আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে উদ্যোগী হন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, পরিচালক, দার্শনিক, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা ও সহায়তাকারী। নিরলস শ্রমের মাধ্যমে তিনি নিজেকে 'জ্ঞানের ভাণ্ডারে' পরিণত করেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষার্থীর আবেগ, অনুভূতি, রুচি, আগ্রহ, মানসিক ক্ষমতা ও মনোযোগ বিবেচনা নিয়ে জ্ঞান বিতরণ করেন। কেননা শিশু মনোবিজ্ঞানে তাকে অবশ্যই পারদর্শী হতে হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। এ বিশাল সংখ্যক শিক্ষক ও নবীন শিক্ষক তৈরির জন্য নূতন নূতন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ অপরিহার্য। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ অন্য যে কোন বিনিয়োগ অপেক্ষা উত্তম ও অপরিহার্য।

দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষ থেকে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করেছে। ইনস্টিটিউটি ৪ বৎসর মেয়াদী (অনার্স) ও ১ বছর মেয়াদী এম.এড কোর্স প্রবর্তন করেছে। উপরন্ত শিক্ষা বিষয়ে এম.ফিল ও পিএইচডি, ডিগ্রী প্রদানেরও পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে দুটি শিক্ষাবর্ষে ২৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৮ সাল হতে প্রতি বছর ১২৫ জন করে বি.এড ও এম.এড ডিগ্রীধারী দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষিত নবীন শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলাও সামাজিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে দেশজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারায় আধুনিক ধাঁচের শিক্ষা কর্মী হিসেবে আত্মবিনিয়োগে সক্ষম হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করেছেন। যেমন-শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্তকরণ, পাঠদানে নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন, তথ্য প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার, অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির অনুশীলন, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষামূলক সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, একীভূত শিক্ষা, শিক্ষার্থী-বান্ধব পরিবেশ, সৃজনশীলতা, আচরণিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জন ইত্যাদি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট অন্যান্য পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিরেই চালু করা উচিত। মানসম্মত শিক্ষা কিংবা গুণগত শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত হতে চায় না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের বেতন স্কেল আকর্ষণীয় নয়। সব স্তরের শিক্ষকদের জন্যে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল রাজনৈতিক কূটকৌশল না হয়ে তার বাস্তবায়ন আবশ্যক। সমাজে আদর্শবান হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একটি প্রদীপ অন্য একটি প্রদীপকে তখনি প্রজ্বলিত করে, যখন এটি নিজের শিখা নিরবিচ্ছিন্নভাবে উজ্জীবিত রাখে। সুতরাং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যে স্বল্প, মধ্যম, দীর্ঘমেয়াদী ও রিফ্রেশারস্ কোর্স প্রণয়ন করে যুগোপযোগী সৃজনশীল শিক্ষণ কলা-কৌশল অনুশীলন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে এরূপ সুপারিশ করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতি সাত বছরে এক বছর ছুটি দেয়া উচিত, যাতে তিনি অন্যান্য দেশে গিয়ে সেসব দেশে কী ধরনের গবেষণা ও কাজ হচ্ছে তা জানতে পারেন। তবে আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে বাজেটের সামান্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণে বরাদ্দ থাকে। সরকারি পর্যায়ে কিছু কিছু প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন-বিএমটিটিআই, ৯টি এসইএসডিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই। সাধারণত চাকুরীকালীন শিক্ষকদের এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নায়েম, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর ভৌত সুবিধা, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, শিক্ষণ-শিখন উপকরণ বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ জিডিপির ২.৪% ওপরে কখনই ওঠেনি। বিজ্ঞজনদের অভিমত, এটি অচিরেই ৬% উন্নীত হওয়া আবশ্যক। অথচ প্রতিবেশী ভারত ও নেপালে ৫.২% বরাদ্দ থাকে। উক্ত দেশগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা, নাগাসিকায় এটম বোমার ভয়াবহ ধ্বংস স্তুপ থেকে জাপান শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। অল্প সময়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন মনে করেন যে, দারিদ্র্য, বিমোচনে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন জরুরী। সুতরাং শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য চাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিনিয়োগ। উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হোক শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ। পরশ পাথরের ছোঁয়ায় বিকশিত হোক শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থা।

মো. জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, গবেষক
ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাহমুদ হাসান রাসেল

শিক্ষার মান উন্নয়ন: আমাদের করণীয়

একটি দেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতি বিনির্মাণের প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা তৈরি করে আগামী দিনের সু-সংগঠিত, সচেতন ও দক্ষ জনগোষ্ঠী। সে কারণে আধুনিক বিশ্বে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষত বড় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অথচ এখানে এখনও সকল মানুষের ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন গড়ে তোলা হয়নি। এর ফলে আমরা যেমন উন্নতির লক্ষ্য অর্জন করতে পারছি না, তেমনি আমাদের মানবিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও দিন দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আমরা শুধু সস্তা শ্রমের জাতি হিসেবেই পরিচিতি পাচ্ছি এবং আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছি না।

শিক্ষা অমূল্য ধন। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমরা দেখেছি পূর্বে গ্রামের স্কুলগুলোতে ভালো লেখাপড়া হত। অভিভাবকগণ স্কুলগুলির খবর রাখতেন। স্কুলগুলি ছিল গ্রামের সবার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যখন থেকে সরকারী শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী শিক্ষা চালু হলো তখন থেকেই ধনী এবং সচ্ছল পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যয়বহুল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করলো। এই বৈষম্য দূর করতে হলে আমাদের প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে কে কিভাবে যুক্ত এবং কার কী দায়িত্ব। আমার দৃষ্টিতে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যেমন:

• শিক্ষকের দায়িত্ব

১. নিজেরা সময়মত স্কুলে আসা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
২. সঠিকভাবে পাঠদান;
৩. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রহার না করা;
৪. দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের বেশী সময় দেয়া;
৫. সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
৬. নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ করা;
৭. অনুসরণীয় আচরণ বজায় রাখা, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের কাছ থেকে সদাচারণ শিখতে পারে;
৮. বিদ্যালয়ের সকল সমস্যা ম্যানেজিং কমিটিকে অবহিত করা;
৯. প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;
১০. শিক্ষকের ভূমিকা হতে হবে সহায়ক সুলভ;
১১. সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখা;
১২. যে কোন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা;
১৩. সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা নিয়মিত তৈরি করা এবং পূর্বেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়া।

• অভিভাবকের দায়িত্ব

১. সন্তানদের সময়মত বিদ্যালয়ে পাঠানো;
২. নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা;
৩. সন্তানদের প্রতি প্রহার না করা;
৪. দুর্বল সন্তানদের অতিরিক্ত সময় দেয়া;
৫. সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
৬. পুষ্টির দিকে খেয়াল রাখা;
৭. শিক্ষা উপকরণ যোগান দেয়া;
৮. ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা;

৯. পরিবারে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখা;
১০. সন্তানদের সামনে ঝগড়া না করা;
১১. যেসব বই পড়লে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে সেসব বই শিশুদের জন্য সংগ্রহ করা;
১২. শিশুকে খেলাধুলা, বাগান করা এসব বিষয়ে উৎসাহিত করা;
১৩. যুক্তি দিয়ে শিশুদের সমস্যার সমাধান করা;
১৪. বিষয়ভিত্তিক শেখার আগ্রহ জন্মাবার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা;
১৫. জানার জন্য শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা;
১৬. সমাজের ভাল মানুষদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করে দেয়া;
১৭. যেসব খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশু চিন্তাশীল হয়ে উঠবে সেগুলোর সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেয়া;
১৮. হোমওয়ার্ক ঠিকভাবে করছে কিনা তা দেখা;
১৯. নির্দেশিকা যাচাই করা;
২০. প্রয়োজনে ছুটি নিলে তা বিদ্যালয় প্রধানকে অবগত করা।

• শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব

১. নিয়মিত ও সময়মত স্কুলে আসা;
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন মেনে চলা;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা;
৪. নিয়মিত পড়াশোনা করা, পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানদায়ক ও আনন্দদায়ক বই পাঠ;
৫. শিক্ষার উপকরণ যত্ন সহকারে ব্যবহার করা;
৬. বিনোদন বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা;
৭. অভিভাবক ও শিক্ষককে নির্ভয়ে প্রশ্ন করা;
৮. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা;
৯. খেলাধুলা করা;
১০. সময়মত ঘুমানো ও খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়া।

• স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

১. শিক্ষকরা সময়মত ও নিয়মিত স্কুলে আসে কিনা তার খোঁজ-খবর রাখা;
২. ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা নিয়মিত করে কিনা তার খোঁজ-খবর রাখা;
৩. শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করা;
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা উপকরণ আছে কিনা তার খবর রাখা;
৫. সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা;
৬. বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা;
৭. শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা;
৮. শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা;
৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত সকলকে সাথে নিয়ে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা;
১০. যোগ্যতা এবং দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

১. খেলাধুলার ব্যবস্থা করা;
২. সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
৩. প্রতিষ্ঠানের জায়গা বাড়ানো;
৪. অবকাঠামোগত উন্নয়ন (শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার ইত্যাদি) করা;
৫. বিভিন্ন দিবস সম্বন্ধে জানানোর জন্য যথাযথ উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা;
৬. খেলাধুলার আয়োজন করা;
৭. নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা;
৮. অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করা;
৯. পাঠাগারে যেসব বই থাকবে তার তালিকা তৈরি করে অভিভাবকদের দেয়া;
১০. বই নির্বাচনসহ শিশুসংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে শিশুদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া;

এছাড়া বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক রিপোর্ট কার্ডে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

একাডেমিক ফলাফল

বিদ্যালয়ের একাডেমিক ফলাফল একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বিশেষভাবে তুলে ধরে। (বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় একটি বিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে, তার মধ্যে কতজন ট্যালেন্ট পুলে আর কতজন সাধারণ গ্রেডে উত্তীর্ণ হচ্ছে- এই বিশ্লেষণ সেই নির্দিষ্ট বিদ্যালয়কেই করতে হবে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাগুলিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক গড় নম্বর কত রয়েছে, গড় নম্বর কত হওয়া দরকার, সেটাও সেই নির্দিষ্ট বিদ্যালয়কে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এই তথ্যগুলি রিপোর্ট কার্ডে সন্নিবেশিত হতে পারে। (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে) মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা, এস এস সি পরীক্ষায় একটি বিদ্যালয়ের অর্জনসমূহ কী কী, বিষয়ভিত্তিক গড় নম্বর কত আছে, কত হওয়া দরকার-এসবের বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী এবং এর ভিত্তিতে টার্গেট নির্ধারিত হতে পারে।

সৃজনশীল কর্মকান্ড

বিদ্যালয়ের নিয়মিত সৃজনশীল কর্মকান্ড যেমন- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা, বিতর্কচর্চা, গণিত উৎসবসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায় এবং শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করে তোলে। বিদ্যালয়ে এসকল কর্মকান্ড নিয়মিত আয়োজন করার পরিকল্পনা থাকলে বিদ্যালয়ের মানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা

শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে, তবে ডিগ্রী থাকলেই একজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ বিদ্যালয়কেই নিতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদানের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স কোর্স-এর আয়োজন করা যেতে পারে। এ সংক্রান্ত বিষয় রিপোর্ট কার্ডে যুক্ত হতে পারে।

বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা

শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও মানের পরিবর্তনে কার্যকরী ভুমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের সাথে স্কুল সময়ের বাইরে যোগাযোগ রাখা, তারা পড়ালেখা সংক্রান্ত বা অন্য কোন সমস্যায় পড়লে সহযোগিতা করা প্রভৃতি শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক উন্নত করতে পারে। এ বিষয়গুলি রিপোর্ট কার্ডে যুক্ত হতে পারে এবং এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের মানে পরিবর্তন আনতে পারে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্পৃক্ততা

শিক্ষকদের ইতিবাচক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে ভূমিকা পালন করা, বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা,অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে পর্ষদের ভূমিকা বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা

বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বিদ্যালয়ের মানের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভুমিকা পালন করে। স্থানীয় নাগরিকরা সম্পৃক্ত থাকলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনেক প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। বর্তমানে সম্পৃক্ততা কতটুকু রয়েছে, কতখানি দরকার তার বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতে করতে পারলে পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ

বিদ্যালয়ের মানের পরিবর্তনে অনেক নতুন কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা জরুরী। এক্ষেত্রে তহবিলের প্রয়োজন হতে পারে। তহবিল সংগ্রহের জন্য বিদ্যালয়ের বর্তমান উদ্যোগের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কিনা-এ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতে করতে পারলে পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অভিভাবক-শিক্ষক সভা

বিদ্যালয়ে নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ হওয়া দরকার, যার মধ্য দিয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সন্তানের শিক্ষার উন্নয়নে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে, তা তারা উপলব্ধি করবেন। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বেশি সময় অবস্থান করে। সে সময়টিকে তারা যাতে করে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে অভিভাবক বা মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যালয়ে এটি নিয়মিত হয় কিনা সেটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

বিদ্যালয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার

বিদ্যালয়ে নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত ছুটি মিলে মোট ছুটি কতদিন, মোট কতদিন ক্লাস নেয়া সম্ভব, শিক্ষা পাঠ্যক্রম শেষ করতে কতদিন সময় লাগবে-এ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা/ক্যালেন্ডার থাকা জরুরী। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা পাঠ্যক্রম শেষ করা সম্ভব।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা

প্রতি বছর বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা নির্ধারণ জরুরী। কারণ, বিদ্যালয় যদি প্রত্যাশার ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, একাডেমিক ফলাফল, স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশা নির্ধারণ এবং প্রত্যাশার ভিত্তিতে করণীয় সম্পাদন বিদ্যালয়ের মানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ হতে হবে সহায়ক। সহায়ক পরিবেশ বলতে এখানে অবকাঠমো হতে হবে আধুনিক এবং পরিবেশ খোলামেলা। চিত্তবিনোদন এবং খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে নিয়মিতভাবে। সর্বোপরি, এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একতা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততাও প্রয়োজন । এক্ষেত্রে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কার্যক্রম অনুসরনীয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিয়নে হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উজ্জীবক, গণগবেষক, নারী নেত্রী ও ইয়ূথ লীডারগণ শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটি এবং স্কুল ম্যানিজিং কমিটির সমন্বিত কার্যক্রম চলমান রাখতে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অভিভাককদের সচেতন করতে এবং তাদের শিশুদের স্কুলগামী করতে উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইনসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রেখেছেন।

সর্বোপরি, দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমানে সময়ের দাবী। এই দাবী পূরণে সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। তবেই আমরা পাবো একটি সমৃদ্ধ দেশ ও শিক্ষিত জাতি।

মো. মাহমুদ হাসান রাসেল
প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ

রোজা শাওয়াল রিজওয়ান

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নির্যাতন: আর কতদিন?

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্ধারিত সময়সূচি, সিলেবাস, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত বিধিবিধান/ অনুষ্ঠানমালা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের আনুক্রমিক কর্মসূচি পালনে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এখন বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষাই যেহেতু সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি, সকল শিক্ষার মূল বিনিয়োগও এখানেই। এসব বিবেচনায় সরকারের বিনিয়োগটাও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ বড় অংকের। এই বিনিয়োগকে কার্যকর করে তোলার জন্য, স্কুলে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এবং ধরে রাখার জন্য গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। সুন্দর আগামীর প্রস্তুতি নিতে এখন বিশ্বের সকল শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় মাতৃভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা এবং প্রযুক্তির ভাষা রপ্ত করতে। কিন্তু বৈশ্বিক যুগের এমন প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাচিত্র বেশ ভিন্ন যা একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমাকে প্রতিনিয়ত আহত করে।

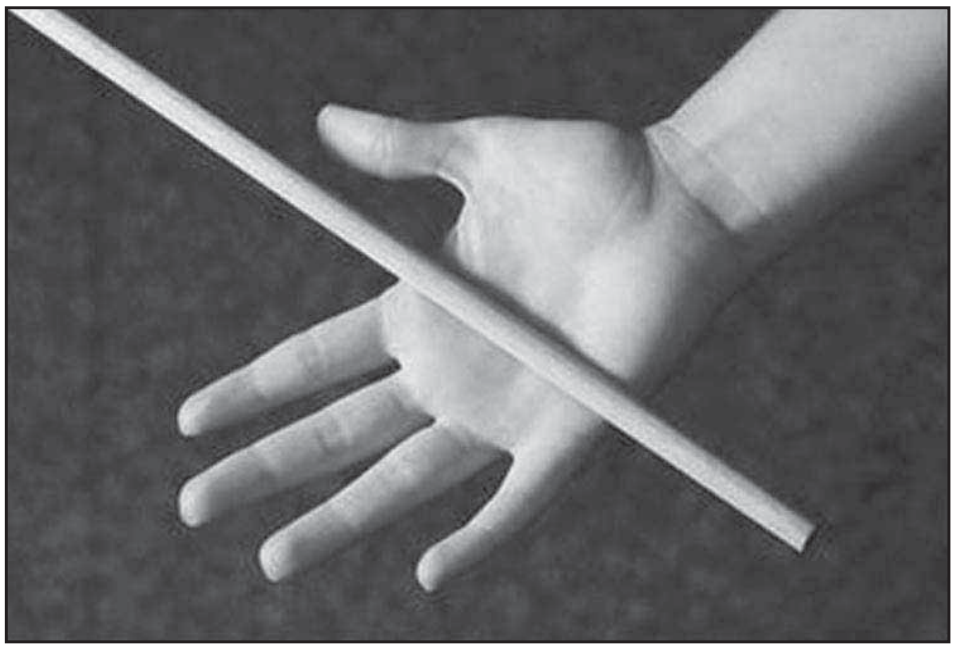

সময়ের দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যেখানে আরো আকর্ষণীয় করা দরকার সেখানে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার এই স্তরে বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এই নির্যাতনের মাত্রা কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করছে যা আমাদেরকে রীতিমত আতঙ্কিত করে। এই যেমন- ৮ এপ্রিল *প্রথম আলো*-র বিশাল বাংলা পাতায় প্রকাশিত 'বেত্রাঘাতে ১৬ শিক্ষার্থী আহত' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বগুড়া শহর, শেরপুর উপজেলা ও ঠাকুরগাঁও সদরে চারটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পিটুনিতে ১৬ জন শিক্ষার্থী গুরুতর জখম হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।' এই নির্যাতনের কারণ অতি নগণ্য। ঠাকুরগাঁওয়ে টাকার জন্য স্কুল ইউনিফর্ম কিনতে না পারায় শিক্ষক এক শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাতে আহত করেছেন। বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা প্রি-ক্যাডেট হাই স্কুলের মেধাবী শিক্ষার্থী সম্রাট হোসেনকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করেছেন খণ্ডকালীন এক শিক্ষক। সম্রাটের দোষ, 'খণ্ডকালীন শিক্ষক'-কে গল্পগুজব না করে পাঠদান করার জন্য অনুরোধ করেছিল সে। বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বিশ্বা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয় এবং কল্যাণী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক ১৪ জন শিক্ষার্থীকে বেত দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছেন। (*প্রথম আলো*, ৩০ এপ্রিল ২০১৪)। এমন ঘটনা স্কুল- মাদ্রাসায় হরহামেশাই ঘটেছে, কিন্তু কয়টাই বা গণমাধ্যমের নজরে আসে? গণমাধ্যমের নজরে আসলেও কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না। শিক্ষার্থী নির্যাতনের ফলে কোনো নির্যাতনকারী শিক্ষকের শাস্তির ঘটনা নেই বললেই চলে। প্রশ্ন হল, শিশুদের নির্যাতন কি শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? শিক্ষকদের জেনে নিতে হবে তাদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা।

শিশুরা চঞ্চল হবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি অতিমাত্রায় চঞ্চল হয় বা স্কুলের বিধিবিধান না মানে সেটা নিরসন করতে হবে ভাল আচরণের মাধ্যমে, শিষ্টাচার শিক্ষার মাধ্যমে, বেত্রাঘাতের মাধ্যমে নয়। কোনো শিশু যদি ঠিকমত ক্লাসে না

আসে, বাড়ির কাজ প্রস্তুত না করে, ক্লাসে মনোযোগ না দেয়, অ্যাসেম্ব্লিতে না আসে, অন্য শিশুদের সাথে না মেশে, খেলাধুলা না করে, তবে সেসবের কারণ নিরূপণ করতে হবে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষকসুলভ আচরণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের করণীয় সম্পর্কে জানতে হবে এবং চর্চা করতে হবে। শিশুদের স্কুলমুখী করতে, পড়াশোনায় আগ্রহী করতে শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রণ্য।

শিশু নির্যাতন একটি অমানবিক অপরাধ। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র'-এ শিশু নির্যাতনের বিরূদ্ধে বলা হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এ ঘোষণাপত্র মান্য করতে হবে। বাংলাদেশে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' রয়েছে। কোনো কারণে নারী ও শিশু নির্যাতন করা হলে ঐ ধারায় মামলা করা যায়।

কর্মক্ষেত্র এবং অন্যত্র নারী ও শিশু নির্যাতন করার মামলা করা হলেও বিদ্যালয়ে শিশুদের নির্যাতনের মামলা সহসা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, শিক্ষকদের প্রতি ভয় এবং পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা।

বেশির ভাগ সময় আমরা শিশু নির্যাতন বলতে শিশুশ্রমই বুঝি। তবে বিগত কয়েক বছরে যে বিষয়টি বেশি নজরে এসেছে, তা হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন। শিক্ষাক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দমন করার জন্য আইন থাকলেও তার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এখনো আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা স্কুলগুলোতে নীরবে নিভৃতে শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। স্কুলগুলোয় মনিটরিং সিস্টেম না থাকায় তার কোনো হিসেব রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ কেমন সমাজে বসবাস করছি আমরা, যেখানে পিতৃ-মাতৃসম শিক্ষকেরাই শিক্ষার্থীর গায়ে হাত তোলেন। আমরা কি পশুর চেয়েও অধম হয়ে যাচ্ছি?

শিক্ষকরাও মানুষ, তাঁদেরও মন আছে। লক্ষ করা যায়, শিশুদের মারার সময় তাঁরা মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়ে যান। অভিজ্ঞতার আলোকেই বলি- আমার প্রাক্তন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রী পড়া না পারায় রোজ মার খায়। আমার স্যার নিজেই বলেন, ওর মস্তিষ্ক বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না। অথচ তিনি নিজেই তাকে মারছেন।

আমি যখন প্রথম ঐ স্কুলে ভর্তি হতে যাই, প্রিন্সিপালের টেবিলের ওপর একটি বেত দেখি ঠিক তখনই শুনি পাশের ক্লাসের শিক্ষিকা বলছেন, 'এক চড় লাগাব।' আমার মা প্রিন্সিপালকে এ নিয়ে অবগত করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বলেন, 'কিছু বাচ্চা আছে যাদের এভাবে না বললে পড়ালেখা করে না।'

স্কুলে শিক্ষার্থীরা আসে শেখার জন্য, প্রহৃত হবার জন্য না। স্কুল শিশুদের বিচরণক্ষেত্র, এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সাথে সাথে সামাজিক দক্ষতা ও মনের বিকাশ ঘটায়। মেলামেশার মাধ্যমে স্কুলে খাপ খাইয়ে নেয়ার সুযোগ পায়। সেখানে শিক্ষকরাই যদি শিশুর ওপর নির্যাতন চালান, শিক্ষার্থী কিভাবে নিজেকে বিকশিত করার পরিবেশ পাবে?

শিক্ষকের অবস্থান মা-বাবার পরেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁরাই শিক্ষার্থীদের মা-বাবা। তাঁরা যখন শিশুদের মারেন, এটা তাদের অবুঝ মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তা কি তাঁরা একবারও ভাবেন না? এর ফলেই পড়াশোনায় তাদের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। 'গুরুজনে সম্মান কর' এ প্রবাদটি তখন তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। শিশুদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হলেও মানসিক নির্যাতনের শিকার শিশুদের কষ্ট কেউ বোঝে না। মা-বাবাকে এ ব্যাপারে বললে তাঁরা বিষয়টি ভাল করে বোঝাবার চেষ্টা না করে উল্টো আরো বকেন। এর ফলে শিশু, শিক্ষক ও মা-বাবাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বদলে শিশুরা ভয় ও ঘৃণার চোখেই দেখে।

শিক্ষক যখন একজন শিক্ষার্থীকে মারেন, তখন তার কি কোনো অনুভূতি হয় না? প্রশ্নটি আমি আমার এক প্রাক্তন স্যারকে করায় তিনি বললেন, 'তুমি মনে করছ আমরা মার না খেয়ে বড় হয়েছি? যারা পড়ে না, তাদের বকে ঠিক করা যায় না। মার ছাড়া কেউ মানুষ হয় না।'

আইনে যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন নিষেধ, অনেক শিক্ষক কিন্তু এখনো মনে করেন মার না খেলে কিছু শেখা হয় না। তাঁদের ভয়ে শিশুরা তটস্থ থাকে, আর তাঁরা ভাবেন, আহা, ছেলেটি আমাকে কতই না শ্রদ্ধা করছে। তাঁদের মারের ফলে যে শিক্ষার্থীদের অন্তর তাঁদের প্রতি কতটা বীতশ্রদ্ধ, তা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানেন না।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২-এ লক্ষ্য হিসেবে স্পষ্ট বলা আছে, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।' আর, 'শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

পৃষ্ঠা-৩-এ আছে, ' শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।' পৃষ্ঠা-১২-তে আছে, 'শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা'।

অনেক শিক্ষক শিক্ষানীতিকে খুব একটা আমলে নেন না। যেখানে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা আছে যে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে যেন তারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়। সেখানে সুরক্ষাকারী শিক্ষকেরাই এ কাজ

করছেন। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন। কারণ, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীতি করা হয়েছে।

মারের ফলে যে কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। এর ফলে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে যাবার নাম করে অভিভাবকদের ফাঁকি দিচ্ছে এবং অকালে ঝরে পড়ছে।

শ্রদ্ধা আর ভয় কখনোই এক নয়, যদিও অধিকাংশ শিক্ষকই তা মনে করেন। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার শিশুরা তাদের নির্যাতনকারী শিক্ষকদের ভয়ের চোখে দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষকরা ভাবছেন, মারের ফলে সে তাকে শ্রদ্ধা করছে।

আমার সেই প্রাক্তন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ইমরান (ছদ্মনাম) নামের এক ছাত্রকে একদিন আমাদের একজন স্যার (যিনি বিচিত্র শাস্তির পন্থা উদ্ভাবনের কারণে মম স্যার নামে পরিচিত) কান ধরে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি ঘোরাচ্ছিলেন এবং স্কেল দিয়ে মারছিলেন। এক পর্যায়ে ইমরান বলে উঠল, 'স্যার, এত কষ্ট দেন কেন?' স্যার বলেন, 'অংক পারিস না তখন কষ্ট লাগে না? মারার সময়ই শুধু কষ্ট?'

এ ধরনের নির্যাতনের ফলে শিশু পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারায়। পড়াশোনা মানে তার কাছে আনন্দ নয়, বরং ভয়, মার খাওয়া ও শাস্তি পাওয়া। সুতরাং এখন শিশু নির্যাতন বলতে শুধু শিশুশ্রম বুঝলেই হবে না, বিদ্যালয়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকেও বুঝতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করতে চাই, রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর পাখিটার সেই উচিত শিক্ষা নয়। শিক্ষক সমাজকে স্মরণ করিয়ে উদ্ধৃত করতে চাই-

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়।'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?"

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?"

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হু করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল। (*তোতা কাহিনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাখিটাকে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার গরমিল খুব অল্প। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ গল্পটি লিখেছিলেন।

দেশে এর বিরুদ্ধে আইন থাকলেও এর সঠিক বাস্তবায়ন নেই। নির্যাতনমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ব, এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

রোজা শাওয়াল রিজওয়ান
ছাত্রী, অষ্টম শ্রেণী

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এক শিক্ষকে চলছে বিদ্যালয়

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে সগুনা ইউনিয়নের কাটাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। ওই একমাত্র শিক্ষক নাছিমা খাতুন বলেন, একজন মানুষের পক্ষে শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে এ বিদ্যালয়ে। সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের ঠিকমতো পড়ালেখা করাতে পারছেন না বলেও জানান।

একসময় ভালো মানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি ছিল বিদ্যালয়টির। প্রতি বছর এখান থেকে বৃত্তি পেত একাধিক শিক্ষার্থী। কৃষিনির্ভর ৩ গ্রামের সাড়ে শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করত এখানে। বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে কমতে ২২৭ জনে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ে এখন পড়ালেখা হয় না বললেই চলে। হবেই বা কী করে? এটি যে এখন চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। বিদ্যালয়টি এক বছর ধরে এভাবেই চলছে।

১৯৭১ সালে বিদ্যালয়টি এ অঞ্চলের শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ হামিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ রয়েছে ৪টি। গত অবসরে যান ২ জন এবং শিক্ষা অফিসকে ম্যানেজ করে পিটিআইয়ে যান একজন। সম্প্রতি সরেজমিনে জানা যায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ কম। একমাত্র শিক্ষক নাছিমা খাতুন একটি শ্রেণীতে পাঠ দিচ্ছেন। অন্য শ্রেণীগুলোয় চলছে শিক্ষার্থীদের চেঁচামেচি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সাদিয়া ও চৈতী বলে, আমাদের স্যার এনে দেন। স্যার না থাকায় আমাদের ক্লাসের অনেক বন্ধু বিদ্যালয়ে আসা বাদ দিয়েছে। কাঁটাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মনিরুল ইসলাম জানান, এক সময় বিদ্যালয়ে সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী ছিল। শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে ২২৭ জনে দাঁড়িয়েছে। শুধু পাঠদানই নয়, জাতীয় পতাকা ওড়ানো, ঝাড়ু দেওয়া, শিক্ষকদের মাসিক সভায় যোগ দেওয়া সব কাজই নাছিমা খাতুনকে করতে হয়।

তাড়াশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সোলাইমান আলী জানান, ওই স্কুলে এক শিক্ষক আমি তা জানি না। এ কথা বলে আধা ঘণ্টা পর ফোন করতে বলেন। পরে বলেন স্লিপের (মেরামত কাজে সরকারি বরাদ্দের) টাকা দিয়ে একজন ভাড়াটে শিক্ষক রাখা হয়েছে।

আমাদের সময় ২.০৭.২০১৪

বাউবির ভৌতিক পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষায় তাদের কোনো অতিরিক্ত বিষয় ছিল না। এ জন্য তারা কেউ নিবন্ধনও করেনি, টাকাও জমা দেয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) কম্পিউটার শাখা বলছে, তারা ওই পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। এ জন্য তাদের ফল প্রকাশিত হয়নি।

যে বিষয় শিক্ষার্থীদের ছিলই না, সে বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে শিক্ষার্থীরা। বাউবির এমন ভৌতিক পরীক্ষায় পটুয়াখালির খেপুপাড়ার জীবন আটকে গেছে।

খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাউবির এসএসসি টিউটোরিয়াল কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, বাউবির এসএসসি প্রোগ্রামের ২০১২ সালের ফাইনাল পরীক্ষা ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হয়। মার্চ মাসে ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ফল তৈরির সময় বাউবির কম্পিউটার শাখা ভুল করে ২৯ জন শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে অর্থনীতি এবং ১১ জন শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও ভূগোল দেখায়। তারা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের কেউ অনুপস্থিত নয়তো 'উইথেলড' (স্থগিত)। এ কারণে ওই ৪০ জন শিক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করেনি।

এ ব্যাপারে বাউবির এসএসসি টিউটোরিয়াল খেপুপাড়া কেন্দ্রের তৎকালীন কেন্দ্র সমন্বয়কারী অতুল চন্দ্র দাস বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছরই এ ধরনের ভুল করা হয়। শিক্ষার্থীরা যে বিষয় নিয়ে ভর্তি হয়, সেসব বিষয়ের পরিবর্তে অন্য একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। আবার অতিরিক্ত বিষয় না নিলেও তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। এর জন্য শিক্ষার্থীদের ভুগতে হচ্ছে। ওই ৪০ শিক্ষার্থীর ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জানিয়েও কোনো সুরাহা পাইনি।'

বাউবির পটুয়াখালী কার্যালয়ের সমন্বয়কারী কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন বলেন, 'আমি আজকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উপনিয়ন্ত্রকের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছি। শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র বাউবি কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।'

প্রথম আলো ৫.০৭.২০১৪

সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে ৩৫০ স্কুলে নতুন প্রকল্প

সামাজিক সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সরকার 'জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে দেশের ৩৫০টি মাধ্যমিক স্কুলে এসিড সন্ত্রাস ও যৌতুক প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এজন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন পেতে পারে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ কোটি ৮৮ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। ইউএনএফপিএ'র আর্থিক সহায়তা সরকার দক্ষতাভিত্তিক এই প্রকল্পটি ২০১৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ৩৫০টি মাধ্যমিক স্কুলে নারীর ক্ষমতায়ন, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বয়ঃসন্ধিকাল-বান্ধব সেবা প্রদান, লিঙ্গ সমতাভিত্তিক আচরণ ও সম্মানবোধ তৈরি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধে ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হবে। একই সঙ্গে পপুলেশন কন্ট্রোল এইচআইভি-এইডস, প্রসূতিকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের সচেতন করা হবে।

বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলা এবং বরিশাল শহর ও ঢাকা মহানগরীকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩৫০টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে পটুয়াখালীর ১৫০টি, বরগুনার ১০০টি, বরিশালের ৪০টি ও ঢাকা মহানগরীর ৬০টি রয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার মূল ধারা সুসংহত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ইউএনএফপিএ'র অর্থায়নে ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে 'লাইফ স্কিল বেইজড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এডুকেশন ফর ইন ইয়ুথ অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্টস থ্রু পিয়ার অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক অনুরূপ একটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ওই প্রকল্পের কার্যক্রম কক্সবাজার ও সিলেট জেলায় বিস্তৃত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় 'জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রজেক্ট' হাতে নিয়েছে সরকার।

প্রজেক্টের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে– শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন, প্রকল্প এলাকার ৩৫০টি স্কুলে একটি করে কম্পিউটার প্রদান, আন্তঃস্কুল ডিবেট প্রোগ্রাম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন, এক্সচেঞ্জ ভিজিট, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেণ্ডার বেইজড ভায়োলেন্স (জিবিভি) ও অ্যাডোলেসেন্টস- সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (এ-এসআরএইচআর) সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

আলোকিত বাংলাদেশ ১০.০৭.২০১৪

গাইবান্ধায় নিরক্ষর নারীদের স্কুল

সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের হাসেমবাজার সরকারপাড়ার শিক্ষাবঞ্চিত নারীরা নিজ উদ্যোগে চালু করেছেন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখানে ছিল শিক্ষাবঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবারের নারীর ভিড়। ৫৪ নারীর গড়ে তোলা হাসেমবাজার পল্লীসমাজ সংগঠনের উদ্যোগে দুই মাসব্যাপী ওই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ দরিদ্র পরিবারের নারী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করবেন। দু'জন কলেজছাত্রী স্বেচ্ছাশ্রমে বয়স্ক কর্মজীবী ওইসব নারীকে শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা উপলক্ষে আয়োজিত

অনাড়ম্বর এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা সদরের ইউএনও মো. আশরাফুল মোমিন খান। এতে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান রশিদা বেগম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা গোলাম ফারুক, মো. জিল্লুর রহমান, আবদুর রশিদ, অমল কুমার দাশ, চৈতন্য দেবনাথ, শিক্ষক জান্নাতি বেগম, মুন্নি আকতার প্রমুখ।

সদস্য মর্জিনা বেগম জানান, ১৯৯৮ সালে গড়ে তোলা তাদের এ সংগঠনটি শুধু নারীদের নিয়ে কাজ করছে। তারা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধে কাজ করছে। এ ছাড়া এ সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০১১ সালে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। এলাকার প্রায় ৩০টি নলকূপের গোড়া পাকাকরণের কাজও করেছে এ সংগঠন।

সমকাল ১০.০৭.২০১৪

দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থীই বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। তার পরও অনেকে ওপরের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনেকে বাংলাও ভালোভাবে পড়তে পারে না। আরও দুর্বল গণিত ও ইংরেজিতে। এ কারণে শিশুদের ঝরে পড়ার আশঙ্কাও বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্যায়ন, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন এবং একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে। প্রাথমিকের এ দুর্বলতা মাধ্যমিকে গিয়েও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অষ্টম শ্রেণীর অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী বাংলায় ৫৬, ইংরেজিতে ৫৬ ও গণিতে ৬৫ শতাংশ নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না।

বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক এক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ঝরে পড়ার পর এক পর্যায়ে তারা অনানুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের পঞ্চম শ্রেণীর মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু বাংলায় এবং ৩৩ শতাংশ শিশু গণিতে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ এ দুই বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৭ শতাংশ শিশু ভালোভাবে শিখছে না।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর (পিইডিপি) অধীন গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়ে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' নামে নতুন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালুর জন্য একটি ভিত্তিরেখা জরিপ চালানো হয়। তাতে দেখা যায়, ওইসব বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ২৫ ভাগের কম শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। গণিতের অবস্থাও একই। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রও প্রায় অভিন্ন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, তার এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে জানতে পারেন, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। অথচ ইংরেজি বইয়ের নাম বানান করে বলতে পারে না একাধিক শিশু। আগামীতে কীভাবে প্রাথমিকের লেখাপড়া ফলপ্রসূ করা যায় সেদিকে আমরা নজর দিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের দুর্বলতার কথা বলা হয়। আমরা শিক্ষকদেরও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, বর্তমানে একেকটি শ্রেণীকক্ষে ৬০-৭০ জন শিশু নিয়ে শিক্ষকরা মুখস্থনির্ভর বক্তব্য দিয়ে চলে যান। এতে করে সব শিশু ভালোভাবে শিখতে পারে না। সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে বাড়তি সুযোগ পেলেও অসচ্ছল পরিবারের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অনেকেই ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, আমরা চাই সব শিশু প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করুক। এজন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, শিশুরা না শেখার জন্য শিক্ষকদের দুর্বলতাও দায়ী। কারণ শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। তিনি বলেন, এ শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তারা বাঁধাধরা পদ্ধতিতে মুখস্থ পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

গুলশান কালাচানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন, শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শ্রমজীবী ও গরিব পরিবার থেকে আসে। ফলে বিভিন্ন সমস্যায় তারা শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী হতে পারে না। শিশুদের বড় একটি অংশ শুধু উপবৃত্তির আশায় বিদ্যালয়ে আসে। ফরাশগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, শ্রেণীকক্ষে অনেক শিশু থাকে। এর মধ্যে সবাই মনোযোগী থাকে না। ফলে সবাই সমান শিখতেও পারে না।

এলাকাভেদে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে চিত্র– শেখার ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল জাতীয় গড়ের (বাংলায় ২৫ ও গণিতে ৩৩ শতাংশ) চেয়ে ভালো করছে। কিন্তু রাজশাহী ও সিলেট অঞ্চল অনেক পিছিয়ে। পঞ্চম শ্রেণীতে গণিতে চট্টগ্রামে যেখানে ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে, সেখানো রাজশাহীতে মাত্র ২৫ শতাংশ (বাংলায় ২১ শতাংশ) ও সিলেটে ১৫ শতাংশ (বাংলায় ২১ শতাংশ) শিশু তা অর্জন করতে পারছে। বরিশালে বাংলায় ২৩ শতাংশ ও গণিতে ৩০ শতাংশ, খুলনায় বাংলায় ২৪ শতাংশ ও গণিতে ৩২ শতাংশ এবং রংপুর বিভাগে বাংলায় ২৪ শতাংশ ও গণিতে ৩৬ শতাংশ শিশু প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। তবে শহরাঞ্চলের চেয়ে মফস্বল এলাকার শিশুরা গণিতে ভালো করছে। বাংলায় শহরাঞ্চলের শিশুরা ভালো করছে।

আমাদের সময় ১২.০৭.২০১৪

ভালো নেই রাজধানীর সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলো

গরিবের স্কুলে পরিণত হয়েছে রাজধানী ঢাকার প্রাইমারি স্কুলগুলো। নিম্নমধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ ছাড়া আর কেউ সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করানোর আগ্রহ দেখান না। এসব স্কুলের অনেকেই প্রাথমিক পর্যায় পেরোনোর পর ঝরে পড়ে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদেরও কোনো মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। কারণ অভিভাবকরা অসচেতন ও দরিদ্র। অনেকটা দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলো ঘুরে এমন তথ্যই পাওয়া গেছে।

সূত্রমতে, সারা দেশে আনুমানিক ৩৭ হাজার ৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাজধানীর বাইরে স্কুলে সচেতন ও বিত্তবান অভিভাবকদের সন্তানরা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করে। কিন্তু রাজধানীতে এসব স্কুলে তারা সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান না। শিক্ষকদের অভিযোগ, সংখ্যায় বেশি হলেও স্কুলগুলোতে শিক্ষাগ্রহণ করছে তুলনামূলক দরিদ্র, অসচেতন পিতামাতার সন্তানরা। অনেক শিক্ষার্থী কুলি অথবা কায়িক শ্রমের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষকরা জানান, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চেয়ে তুলনামূলক অভিজ্ঞ শিক্ষক সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠদানে নিয়োজিত থাকলেও বিত্তবানরা বেশি খরচে ইংলিশ মিডিয়াম অথবা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠায়। আর সচেতন মধ্যবিত্ত পর্যায়ের অভিভাবকরাও কষ্ট করে সন্তানদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ দেখান। রাজধানীর গাবতলী, কল্যাণপুর, মিরপুর-১, মিরপুর-২, পল্টন, ফার্মগেট এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরেজমিন প্রদক্ষিণ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সপ্তাহব্যাপী এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীর আমিনবাজারের মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুরের-১ এর উপশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সকাল), ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বিকাল) এ সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে সচেতন নয়। সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়েই দায়মুক্তি পেতে চান এসব অভিভাবক।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২.০৭.২০১৪

এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষা ২০১৪

১৫ জুলাই ২০১৪ ব্র্যাক-আরইডি সভা কক্ষে এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ সালের সমীক্ষার প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. মনজুর আহমেদ। সভায় *এডুকেশন ওয়াচ*-এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক এবং *এডুকেশন ওয়াচ*-এর সদস্য সচিব রাশেদা কে. চৌধূরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে প্রতিবছর *এডুকেশন ওয়াচ* (*Education Watch*) প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১২টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ২০১৪-এর সমীক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে Access, Quality and Equity Primary Education কে নির্বাচন করেছেন। বর্তমান সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি ও বেসরকারি নানামুখী উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যালোচনা করে তুলে ধরা। পাশাপাশি এটি সরকারের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PDEP-III)-র সাথে সম্পর্কিত বিধায় ভবিষ্যতে এই সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সমীর রঞ্জন নাথ, প্রিন্সিপাল রিসার্চার, এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪-এর ধারণাপত্র/খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। সভায় গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

- ইতোপূর্বে এডুকেশন ওয়াচ থেকে শিক্ষার মান সংক্রান্ত ইস্যুতে যে গবেষণাগুলো হয়েছে বর্তমান গবেষণায় তার একটি তুলনামূলক চিত্র থাকতে হবে।
- একটি Comprehensive Picture পাওয়ার জন্য সব ধরণের স্কুলকে গবেষণার আওতায় আনা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে মাদ্রাসা এডুকেশন কে Address করার জন্য ৩ ক্যাটাগরি স্কুলের পরিবর্তে ৪ ক্যাটাগরি স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩টি Sample-এর সাথে আরেকটি Sampling Frame যোগ করা যেতে পারে
- কারিকুলাম কমিটির সাথে Competency নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা যেতে পারে। Quality বিষয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের Teaching Learning Method, Materials, Curriculum, বিবেচনায় রাখতে হবে। এগুলোর মানদন্ড (Standard) দেখা জরুরী। এছাড়া স্টাইপেন্ড, মিডডে মিল এগুলোর সাথে রিলেশন আছে কিনা তা দেখা দরকার।
- যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Annual Sector Performance Review (ASPR)-একটি জাতীয় পর্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিবেদন সেহেতু এডুকেশন ওয়াচ গবেষণাতেও ASPR তৈরির অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য এডুকেশন ওয়াচ-এর গবেষকরা আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ASPR এর Methodology বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা যেতে পারে
- গণসাক্ষরতা অভিযান এর Mandate, এডুকেশন ওয়াচ-এর পলিসি বিবেচনা করে পরবর্তী কালে সুনির্দিষ্ট এরিয়া ঠিক করে ২০১৪-এর গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হবে যাতে করে ফলাফল নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী, গবেষক সবাই ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি বছর তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PDEP-III)-i Annual Joint Annual Review Mission (JARM)- কে সামনে রেখে এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ এর কাজ সম্পন্ন করা হবে যাতে করে এর ফাইন্ডিংস এবং পলিসি সুপারিশগুলো নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা যায়।

মির্জা কামরুন নাহার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পার্টনারশীপ ব্যবস্থাপনা

১৮ জুলাই ২০১৪ গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পার্টনারশীপ ব্যাবস্থপনা সংক্রান্ত বিষয়ে দিনব্যাপী একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. আব্দুর রউফ।

সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Transparency and Accountability) বৃদ্ধি এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের 'তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন' (পিইডিপি-৩) কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। উক্ত মতবিনিময়

সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের ও ওয়াচ গ্রুপের সাথে যুক্ত সদস্য এবং অভিযানের কর্মকর্তাসহ মোট ২১ জন অংশগ্রহণ করেন।

সামছুন নাহার কলি

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ

গণসাক্ষরতা অভিযান নির্বাচিত সদস্য সংগঠনের মাধ্যমে কমিউনিটি ওয়াচভুক্ত ৩২টি ইউনিয়নে আয়োজন করে আসছে নানাবিধ কার্যক্রম। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, পিটিএ সদস্য, শিক্ষা বিষয়ক ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির প্রতিনিধিসহ ৯০০ জন প্রতিনিধি িগণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত 'প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে তথা শিক্ষার মান উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিত করে এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

১৫ ও ১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউপিতে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। দুই ব্যাচে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মোট ৬০ জন প্রতিনিধি

উপস্থিত ছিলেন। এই কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মুজিবনগর, মেহেরপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আপিল উদ্দিন ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহমেদ। সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মিজানর রহমান আখন্দ।

মিজানুর রহমান আখন্দ

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন

১৭ ও ২১ জুলাই ২০১৪ তারিখে ঢাকায় গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন-এর দুইটি কোর্স আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশন দুটির উদ্বোধন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। তিনি বলেন, এই ওরিয়েন্টেশনের পূর্বে চার দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসিক ওরিয়েন্টেশনে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছিল। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো কতটুকু সম্পন্ন করতে পেরেছি ও ভবিষ্যতে আরো কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে এটাই ফলোআপ ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ের এসএমসিকে সক্রিয় করা, নিয়মিত অভিভাবক সভা করা, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বিদ্যালয়ে আনন্দময় শিখন পরিবেশ তৈরি, কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার আয়োজন, বিভিন্ন দিবস পালনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি বিষয় অংশগ্রহণকারীরা তাদের কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করেন। অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, কমিউনিটি ওয়াচ এলাকার সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও এস-এম-সি সদস্যসহ মোট ৪৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট রাম চন্দ্র দাস এবং অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন।

তাজমুন নাহার

এমআইএস ওরিয়েন্টেশন

২২ জুলাই ২০১৪ তারিখ গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক ও উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনায় সংস্থার কর্মীদের জন্য আয়োজন করা হয় 'অভিযান-এর এমআইএস' বিষয়ক একটি ওরিয়েন্টেশন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিযান-এর পরিচালক তাসনিম আতহার। এছাড়াও সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমআইএস সফটওয়ারটি প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান ''লিংক আপ টেকনোলজি''- এর প্রতিনিধি মো. মোজাম্মেল হুসেইন ও আসিফ আহমেদ দিনার। সভায় এমআইএস সফটওয়ারের বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক পর্যালোচনা করা হয়।

মো. রকিবুল আলম

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপ

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে ২৩ জুন ২০১৪ খুলনা জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা" বিষয়ক জনতার সংলাপ-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়নচন্দ্র চন্দ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান, বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সংলাপ-এর উদ্দ্যেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা-এর নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলমগীর। সংলাপ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিডিডি-র নির্বাহী পরিচালক নোমান আহমেদ।

সংলাপে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন চ্যানেল আই-এর সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার মোস্তফা মল্লিক। সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধানত ছিল খুলনা কমিউনিটি ওয়াচ ও মেহেরপুর কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, স্কুলের শিক্ষক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিটিআই প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা।

সুপারিশমালা:

- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই তাদের নিকট পাঠ্যপুস্তক/উপকরণ পৌছানো নিশ্চিতকরণ।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দেশের উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারী ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।
- উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- কারিগরী শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের আরও বেশী করে সংশ্লিষ্ট করা।
- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম-এর ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন করে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা।

সংলাপ আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় চলমান সমস্যাসমূহ তুলে ধরা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ করা। অনুষ্ঠানটি পরবর্তী কালে সংক্ষিপ্ত আকারে চ্যানেল আই-এ সম্প্রচার করা হয়।

রেহানা বেগম

ডেঙ্গু প্রতিরোধে চাই জনসচেতনতা

ডেঙ্গু কী?

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জ্বর। এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের একমাত্র বাহক। এই মশার কামড়ে ডেঙ্গু ছড়ায়। এডিস মশা দিনের বেলায়, সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যায় কামড়ায়।

ডেঙ্গুজ্বরের সাধারণ লক্ষণ

- ✦ জ্বর (শরীরের তাপমাত্রার আকস্মিক বৃদ্ধি।)
- ✦ মাথা-ব্যথা,চোখের পেছনে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা (বিশেষতঃ মেরুদণ্ডে ব্যথা), বমি-বমি ভাব
- ✦ অনেক সময় শরীরে হামের মত দানা দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বরের ব্যবস্থাপনা

- ✦ *অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গুজ্বর ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।*
- ✦ রোগীকে উপসর্গ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে এবং বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রচুর পানি ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে।
- ✦ দ্রুত জ্বর কমানো একান্ত জরুরি। এজন্য মাথা ধোয়া, ভিজা কাপড় দিয়ে গা মোছা এবং প্যারাসিটামল খেতে দেয়া যেতে পারে। **এ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ কোনভাবেই খেতে দেয়া যাবে না।**
- ✦ মারাত্মক (হেমোরেজিক) ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে/ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- ✦ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়।
- ✦ দিনে ঘুমাবার সময় মশারী ব্যবহার করুন।
- ✦ বাড়ির ভেতর/বাহির/ছাদ এবং আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় পাত্রসমূহ ডাস্টবিনে ফেলে দিন। বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, নালা, নর্দমা এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন।
- ✦ ব্যবহারযোগ্য পাত্রসমূহে (যেমন বালতি, ড্রাম, ফুলের ও গাছের টব, ফ্রিজ এবং এয়ার কন্ডিশনের নিচের পানি ভর্তি পাত্র ইত্যাদি) পানি কোনভাবেই যেন একনাগাড়ে পাঁচ দিনের বেশি জমে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- ✦ অব্যবহৃত গাড়ির টায়ার, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, পরিত্যক্ত টিনের কৌটা, প্লাস্টিকের বোতল/ক্যান, গাছের কোটর, পরিত্যক্ত হাঁড়ি, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে পাঁচ দিনের বেশি যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং প্রয়োজনে অপসারণ করুন।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল নাগরিকের সম্মিলিত সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪২ শ্রাবণ ১৪২১ জুলাই ২০১৪

স ম্পা দ ক

মধ্য- জুলাইয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশের একটি অঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের ওপর একটি সাধারণ জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, শিশুরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এমনকি একটি শিশু তার পাঠ্যবইয়ের নামও বলতে পারেনি। এই সংবাদ আর আমাদের আকস্মিকভাবে বিচলিত করে না, কারণ এমন সত্য ও তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহু বছরের। তবে নিশ্চয়ই এমন সংবাদ আমাদের পীড়িত করে, হতাশ করে। কয়েক বছর আগে *এডুকেশন ওয়াচ* পরিচালিত গবেষণায়ও একই তথ্য বেরিয়ে এসেছিল। এ থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত হয় যে, এমন গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানান সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের প্রত্যাশিত ও যথাযোগ্য তৎপরতার অভাব রয়েছে।

প্রথমেই যে সংবাদের কথা উল্লেখ করেছি, তার কারণগুলো আমাদের অজানা নয়, তাই সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই। কিন্তু ছোট সংবাদটি শুধু ওই এলাকার একটি বা কয়েকটি স্কুলের জন্যই তো প্রযোজ্য নয়। প্রতিবেদনটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ করে কোন এলাকার শিশুরা কোন বিষয়ে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করেছে তার একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্কিক হিসেবপত্র পেশ করেছে। এমন পরিসংখ্যান ও পর্যবেক্ষণও আমাদের ওই উপরে উল্লিখিত *এডুকেশন ওয়াচ* গবেষণা প্রতিবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন সংস্থা থেকে, বিশেষত শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে, বেশ কয়েকটি সমজাতীয় গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায়। এ থেকে একটা বিষয় সহজেই বোধগম্য। যাদের মনোযোগ আর্কষণের জন্য অথবা প্রতিবিধানমূলক কর্মপন্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এমন সব সমীক্ষা চালানো হয়, তাদের টনক কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নড়েনি।

কিন্তু একই সঙ্গে আমরা বিবেচনায় আনতে চাই একটা দেশব্যাপী ছবি। প্রাথমিক পর্যায়ের সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের কী উচ্ছল মাতামাতি! দেখা যাচ্ছে, শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্যই এই সংবাদ আমাদের পুলকিত করে, আলোড়িত করে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আস্থা রাখতে প্ররোচিত করে। কিন্তু একই সঙ্গে এমন একটা ভাবনাও আমাদের বিচলিত করে যে, এইসব উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, আলঙ্কারিক অর্থে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, তারা কি যথার্থ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে, না কি কোচিং পদ্ধতি বা প্রশ্ন Common পড়া বা চতুর কোন Suggestion কৌশলের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা পাশের ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং মানসম্মত শিক্ষার যে অভিলক্ষ্য, সেখানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এমন কথা ইতোমধ্যেই উঠেছে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা এসবকে শুধুই নিন্দুকের প্রথাগত অভ্যাস বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু আমরা কি এ বিষয়ে শিক্ষককুল থেকে একটা নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্য পেতে পারি? এ বিষয়ে শিক্ষক সংগঠনসমূহের বক্তব্য পথের একটা নিশানা দেখাতে পারে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
ঢাকার গালর্স গাইড এসোশিয়েশনের কর্মকর্তা কর্তৃক বিতাড়িত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে।
সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org